একটি বই, একটি চিঠি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল গাফফার

ইখতিলাফে মাযমূম (অযৌক্তিক ও নিন্দনীয় মতভেদ) তো সর্বাবস্থায় বর্জনীয়; এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য একটিই, যা সুনির্দিষ্ট এবং যা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই সত্য থেকে যে বিমুখ হবে ইখতিলাফের গোনাহ ও দায়দায়িত্ব তার উপর। ইখতিলাফে মাহমূদ বা মাশরূ' যা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত - এক্ষেত্রেও বিধান এই যে, একে গলদ তরিকায় ব্যবহার করে বিভেদের দ্বার উন্মুক্ত করা যাবে না। তবে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করে, সংলাপের নীতিমালা মেনে দলীলনির্ভর ইখতিলাফি মাসায়েলে 'ইলমী জিদাল ও মুনাকাশা' তথা আলেমসুলভ বিতর্ক ও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। এবং এই ধারাবাহিকতা অতিপ্রাচীন। আক্ষেপের বিষয়, কিছু মানুষ এখন এধরণের মাসায়েলে 'ইলমী মুনাকাশার' পরিবর্তে রেষারেষি ও অপবাদ আরোপের পথ বেছে নিয়েছে। যে কারণে তাদেরকে নিজেদের আলোচনার ভিত্তি রাখতে হয়েছে অবাস্তব সব দাবি-দাওয়ার উপর। রেওয়ায়েতসমূহের গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রেও তাদের নিতে হয়েছে উসূল ও নীতিমালার পরিবর্তে না-ইনসাফি ও পক্ষপাতিত্বের পথ। এমন কাজ যে-ই করুক বা করে থাকুক সে ন্যায়ের পথ থেকে অবশ্যই বিচ্যুত এবং ইলমের আমানত বিনষ্টের অপরাধে অপরাধী।

'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত' নামের বইটি 'ইলমী মুনাকাশা'র চেয়ে অপবাদ ও না-ইনসাফিরই উপর বেশি নির্ভরশীল। বইটির নাম থেকেই যা অনুমেয়। এর আবরী নামটিও বড় অদ্ভুত। صلاة الرسول صلى الله عليهÔ وسلم بقبضة الأحاديث الضعيفة والموضوعة। নাম তো আক্রোশে ঠাসা, কিন্তু বিশুদ্ধতার দিয়ে শূন্য! আল্লাহর মেহেরবানী যে, এ বইয়ের একটি কপি জনৈক আলেমের হস্তগত হয়। যিনি হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের ভক্ত এবং এক সময় তার মুসল্লিও ছিলেন - তিনি তা মাওলানার কাছে পৌঁছান এবং এ বই সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের অনুরোধ জানান। এই অনুরোধকে গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে মাওলানা এ বিষয়ে এক দীর্ঘ চিঠি

লেখেন। যা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের রূপ লাভ করে। বিষয়বস্ত্ত পুরোপুরি ইলমী ও সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও ভাষার সাবলীলতা ও পাঠ-মাধুর্য তাতে ব্যাহত হয়নি। ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার যতখানি হক আদায় করা সম্ভব তাতেও প্রবন্ধটি সফল,

আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের কাছে নিবেদন, চিঠিটি তারা চিন্তা সহকারে পড়বেন এবং

বারবার পড়বেন। দলীলের বিশ্লেষণসহ ইখতিলাফি মাসায়েল অধ্যয়ন করে যারা

অভ্যস্ত- ইনশাআল্লাহ তারা এতে সেই চাহিদা নিবারণের প্রচুর উপাদান পাবেন। প্রবন্ধকারের কাছে আবেদন, ইনসাফ ও ইলমী গভীরতা এবং ভাষার সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতার এই ধারা বজায় রেখে তিনি সম্পূর্ণ বইটির উপর তার পর্যালোচনা ও

মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে তাকে দীর্ঘ

নেক হায়াত দান করেন। আমীন।

(মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মুহতারাম,

আপনার প্রেরিত মুযাফ্ফর বিন মুহসিন প্রণীত ‘‘জাল হাদীসের কবলে রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছালাত’’ নামক বইটি পেয়েছি। এরূপ একটি বই প্রেরণের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের এনায়েত করুন, আমীন। আপনার পক্ষে বর্তমানে কোনো কিতাবাদি দেখা সম্ভব নয় বিধায় আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, বইটিতে যা বলা হয়েছে তার সত্যাসত্য ও যথার্থতা যাচাই করে আপনাকে জানাতে।

বইটির নাম থেকে শুরু করে উপসংহার পর্যন্ত লেখকের বক্তব্য, উদ্ধৃতি ও হাদীসের ব্যাখ্যাসহ সবকিছুই ব্যাপক ও গভীর আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। কিন্তু এর জন্য যে পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন সেই সময় বের করা আমার পক্ষে কষ্টকর। কারণ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ
أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

সালাত পূর্ণ করে নেয়। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকআত আদায় করতে পারলে তার দ্বিতীয় রাকআতটি সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আদায়কৃত হলেও তার সালাত হয়ে যাবে । সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত নয় বরং সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আদায় করার কথা বলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য: সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সালাত আদায় অন্যান্য হাদীসের বক্তব্য মতে হারাম। সেইসব হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের বক্তব্য সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই হাদীসের প্রায়োগিক ক্ষেত্র কী তা নির্ণয়ে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। সেটি স্বতন্ত্র এক আলোচ্য বিষয়।

সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। লেখকের এই কথাটি এই হাদীসে তো নয়ই কোনো হাদীসেই নেই। দেখুন, লেখক প্রথমে বলেছেন যে, ছুবহে ছাদিকের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এটি শুধু লেখকের বক্তব্য নয়, ওয়াক্ত সংক্রান্ত সব হাদীসের বক্তব্যও তাই। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যখন ফজরের ওয়াক্ত থাকে তখন সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর আদায় করা সর্বাবস্থায় বৈধ হবে। কোন সমস্যা বা ওজর থাকুক বা না থাকুক। সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়’ - লেখকের এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্যা না থাকলে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যাবে না । অথচ একটু পূর্বে তিনি বলে আসলেন যে, ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। লেখকের বক্তব্য এখানে স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে। আসলে ‘সমস্যাজনিত কারণে’ শর্তটি লেখক নিজের পক্ষ হতে যুক্ত করে দিয়েছেন। সহীহ হাদীস জাল হয়ে যায় এভাবেই। আমি ভাবছি, লেখক জাল হাদীসের কবল হতে সালাতকে মুক্ত করার অভিযানে নেমে নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতকে জাল হাদীসের কবলে নিক্ষেপ করলেন না তো? নিজেই নিজের জালিয়াতির জালে আটকা পড়ে গেলেন না তো?

লেখক এরপর লিখেছেন, ‘আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম হিসাবে রাসূল (ছাঃ) খুব ভোরে ছালাত আদায় করতেন। পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই।’ বোঝা যাচ্ছে, লেখক ফজরের মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় ওয়াক্ত কোনটি তা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে লেখকের উচিত ছিল এই কথা লেখা ‘পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করা মুস্তাহাব এই মর্মে কোনো সহীহ দলীল নেই’ । কারণ, ‘করতে হবে’ আর ‘করা মুস্তাহাব’ কথা দুইটির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি অপরিহার্যতা বোঝায় আর দ্বিতীয়টি পছন্দনীয়তা

বোঝায়। করতে হবে মর্মে কোন সহীহ দলীল নেই কথাটি শতভাগ সত্য। এই কারণে আমাদের জানামতে পৃথিবীর কেউ বলেন না যে, পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করতে হবে। লেখক দাবি করতে চাচ্ছেন, পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করা মুস্তাহাব মর্মে কোন সহীহ দলীল নেই অথচ বাক্য ব্যবহার করলেন, 'করতে হবে মর্মে কোন সহীহ দলীল নেই।' এতে পাঠককে বিভ্রান্ত করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

লেখক বলেছেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম হিসাবে রাসূল (ছাঃ) খুব ভোরে ছালাত আদায় করতেন। ''আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম'' কথাটির বরাত দিয়েছেন তিরমিযী শরীফের ১৭০ নং হাদীসের এবং মন্তব্য লিখেছেন, সনদ সহীহ।

তাহকীক: ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটির সনদের উপর মন্তব্য করেছেন এই কথা বলে-

حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوى عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه

ইমাম তিরমিযী রাহ.-এর এই মন্তব্য হাদীসটির সনদকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করে। অথচ লেখক সনদটিকে সহীহ বললেন। ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য অনুযায়ী হাদীসটিতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার আল-উমারী নামক যে রাবী আছেন তিনি যঈফ। তিনি ব্যতীত উম্মে ফারওয়া রা.-এর এই হাদীসটি আর কেউ বর্ণনা করেন না। তদুপরি হাদীসটিতে ইযতিরাব রয়েছে। এতসব দোষ থাকা সত্ত্বেও সনদটিকে সহীহ বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? হাঁ, শায়খ আলবানী রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। লেখক হয়তো তাঁর তাকলীদ করেই বলেছেন, সনদ সহীহ। তাকলীদ যদি করতেই হয় তবে শায়খ আলবানীর কেন, ইমাম তিরমিযীর নয় কেন? তাছাড়া শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সনদটিকে নয়। সনদ সহীহ হওয়া আর হাদীস সহীহ হওয়া এক কথা নয়। পরবর্তী আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে। লেখকের উচিত ছিল শায়খ আলবানী রাহ. হাদীসটিকে কেন সহীহ বলেছেন তা তাহকীক করা।

শায়খ আলবানী রাহ.-এর তাহকীক ও পর্যালোচনা

উম্মে ফারওয়া রা.-এর হাদীসটির সনদ শায়খ আলবানীর মতেও যঈফ। তিনি সুনানে আবূ দাউদে হাদীসটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

و هذا سند ضعيف، عبد الله بن عمر - هو العمرى المكبر- وهو سيئ الحفظ

[illegible]

وهذا اضطراب شديد مما يزيد فى ضعف الاسناد

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

[illegible]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ ، أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ ، حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

الصلاة على وقتها

الصلاة فى أول وقتها

الصـلاة على وقتها

الصلاة فى أول وقتها

الصلاة فى أول وقتها

- ما احسبه حفظه لانه كبر وتغير حفظه

الصلاة فى أول وقتها

الحسن بن على المعمرى عن ابى موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة

الصلاة على وقتها

تفرد به المعمرى فقد رواه أصحاب أبي موسى بلفظ الصلاة على وقتها

الصلاة على وقتها

الصـلاة على وقتها

الصلاة على وقتها

হাজার আসকালানী রাহ . বলেন, প্রকাশ্যত এটাই বোঝা যায় যে , হাসান ইবন আলী আল - মা ‘মারী তাঁর বর্ণনায় ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন । কারণ, তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন ।

বাকী রইল মুস্তাদরাকে হাকেমের উপরিউক্ত ঐ বর্ণনাটি যার দ্বারা উম্মে ফারওয়ার হাদীসটি সমর্থিত বলে শায়খ আলবানী রাহ . মনে করেন। হাদীসটি সম্পর্কে বক্তব্য হল , হাদীসটি মালেক ইবন মিগ্‌ওয়ালের শাগরেদদের মধ্য হতে একমাত্র উসমান ইব্‌ন উমার ব্যতীত আর কেউ الصلاة فى أول وقتها শব্দে বর্ণনা করেন না। তাঁর সকল শাগরেদ তাঁর বরাতে হাদীসটিকে الصلاة على وقتها শব্দেই বর্ণনা করেন । হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রাহ . বলেন, وتفرد عثمان بذلك’ والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة

(অর্থাৎ এইরূপ বর্ণনায় উসমান নিঃসঙ্গ । মালেক ইবন মিগ্‌ওয়াল হতে যা প্রসিদ্ধ তা হল الصلاة على وقتها শব্দে অন্যান্য সকলের অনুরূপ বর্ণনা।)

আপনি বলতে পারেন যে , হাকেম তো হাদীসটিকে على شرط الشيخين তথা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মানে উত্তীর্ণ বলে ব্যক্ত করেছেন ।

এর জবাবে বলব যে , على شرط الشيخين কথাটি কোন্ হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় বা করা হয় তা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন , কোনো হাদীসের সনদে উল্লেখকৃত রাবীগণের সকলেই যদি বুখারী ও মুসলিমের রাবী হন তাহলে সেই হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে , তা على شـرط الشـيخين বা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মানসম্পন্ন । কেউ বলেন, যে হাদীসটির সনদ হুবহু বুখারী ও মুসলিমের সনদ সেই হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে , তা على شرط الشيخين । কেউ বলেন, বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী সেই সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে , তা على شرط الشيخين । দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। এর কারণ কী সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন । তবে সবকটি মতের সার কথা হল , যে হাদীসটিকে على شرط الشيخين বা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মানে উত্তীর্ণ বলে ব্যক্ত করা হয় তার রাবীগণ উচ্চমান সম্পন্ন

সত্যবাদি ও বিশ্বস্ত। কিন্তু কোন হাদীস সহীহ ও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীগণের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণই যথেষ্ট নয়। বরং তাঁদের বর্ণনাটি শায বা দল-বিচ্ছিন্ন না হওয়াও জরুরী। এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি। দল বিচ্ছিন্নতা হাদীস সহীহ হওয়ার পথে একটি বড় বাধা। হাকেমের হাদীসটি এই বাধাকে অতিক্রম করতে পারেনি। কেননা পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি যে, الصلاة فى أول وقتها শব্দে হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে উসমান ইব্‌ন উমার নিঃসঙ্গ। তাঁর উস্তায মালেক ইবন মিগ্‌ওয়ালের শাগরেদগণের কেউই হাদীসটিকে ঐ শব্দে বর্ণনা করেন না।

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও যে সকল রাবী হাদীসটিকে الصلاة على وقتها -এর স্থলে الصلاة فى أول وقتها শব্দে বর্ণনা করেছেন তাঁদের কেউবা স্মৃতি দুর্বলতার শিকার হয়েছেন, আর কেউ সম্ভবত কথা দুটোর অর্থ অভিন্ন বলে ধারণা করে الصلاة على وقتها -এর স্থলে الصلاة فى أول وقتها বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী রাহ. বলেন, وكأن من رواها كذالك ظن ان المعنى واحد (যারা হাদীসটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন তারা হয়তো মনে করেছেন যে, উভয়টির অর্থ এক।) শায়খ আলবানীও (রাহ.) কথা দুটোর অর্থ অভিন্ন বলে ধারণা পোষণ করেন। কেননা তিনি হাকেমের হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলেন: وهو فى الصحيحين وغيرهما بلفظ ,على وقتها، والمعنى واحد عنـدنا (সহীহাঈন ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটি على وقتها শব্দে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে অর্থ একই।) শায়খ আলবানীর সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমি সহমত পোষণ করি না।

কারণ, দ্বিতীয় কথাটির অর্থ হল, ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় করা। আর প্রথম কথাটির স্পষ্ট অর্থ হল, সময়মত সালাত আদায় করা। অর্থাৎ সালাতকে তার ওয়াক্তচ্যুত না করা। প্রতিটি সালাতের শুরু ও শেষের যে নির্ধারিত ওয়াক্ত আছে সেই ওয়াক্তের মধ্যেই সালাত আদায় করা। কাযা না করা।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কেউ বলতে পারে যে, الصلاة على وقتها কে তো আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বলে বলা হয়েছে। কোনো বিষয় অধিক প্রিয় তখনই হয় যখন ঐ বিষয়টির মধ্যে একাধিক ঐচ্ছিকতা বিদ্যমান থাকে এবং তন্মধ্য হতে একটি ঐচ্ছিক বিষয় অন্যটির তুলনায় প্রিয় হয়ে থাকে।

সময়মত সালাত আদায় করা বা কাযা না করা তো অপরিহার্য। অপরিহার্যের মধ্যে কোনো

ঐচ্ছিকতা থাকে না। সুতরাং বোঝা যায় যে, হাদীসটিতে বলা হয়েছে, যে কোনো সময়ে সালাত আদায় করা বৈধ তবে অন্য যে কোনো সময়ে আদায় করার তুলনায় আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব বা অধিক প্রিয়।

এর জবাবে বলব যে, কথাটি যুক্তিযুক্ত। তবে কথাটি আলোচ্য বিষয়ে প্রযোজ্য হত যদি

প্রশ্ন করা হত যে, কোন্ সময়ে সালাত আদায় করা উত্তম। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন্ আমলটি সর্বাধিক উত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, الصلاة على وقتها অর্থাৎ অন্যান্য আমলের তুলনায় সালাতকে সময়মত আদায় করা এবং কাযা না করা অধিক প্রিয়। তুলনা করা হয়েছে অন্যান্য

আমলের সঙ্গে। বলা হয়েছে, সালাত কাযা না করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল। সালাতের পূর্ণ সময়ের একটি অংশকে অপর অংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি।

কথা আরও আছে। তা হল, একাধিক ঐচ্ছিক সময়ের মধ্য হতে আউয়াল বা শুরু সময়ের কথাটি বোঝা গেল কোত্থেকে? এ অর্থ কেন হবে না যে, একাধিক ঐচ্ছিক সময়ের মধ্য হতে মধ্যবর্তী সময়ে বা শেষ সময়ে সালাত আদায় করা অন্য সময়ের তুলনায় অধিক প্রিয়?

এই দীর্ঘ আলোচনার সার দাঁড়ালো এই যে, হাদীসটিকে যাঁরা الصلاة فى أول وقتها শব্দে বর্ণনা করেছেন তাঁরা হয় স্মৃতি বিভ্রাটের শিকার হয়েছেন নয় তো অর্থ

বিভ্রাটের শিকার হয়েছেন। কারণ যা-ই হোক, তাঁদের বর্ণনাটি দল-বিচ্ছিন্ন বর্ণনা।

আর দল-বিচ্ছিন্ন বর্ণনাকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলেন। সম্ভবত এই কারণেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ. তাঁদের গ্রন্থে ঐ শব্দ সম্বলিত হাদীসটিকে স্থান দেননি। যদিও

এর বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত অন্য হাদীস তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আর এই কারণেই ইমাম

নববী রাহ. الصلاة فى أول وقتها শব্দে বর্ণিত সকল হাদীসকে যঈফ বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাফেয ইব্ন হাজার আসকালানী রাহ. তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে ইমাম নববী রাহ.-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন,

وقد اطلق النووى فى شرح المهذب أن واية فى أول وقتها ضعيفة

অর্থাৎ শরহুল মুহায্যাব গ্রন্থে নববী রাহ . ব্যাপকভাবে (কোন ব্যতিক্রম উল্লেখ না করে) বলেছেন যে , فى أول وقتها বর্ণনা যঈফ ।

উল্লেখ্য , এ পর্যন্ত হাফেজ ইবন হাজার আসকালানীকে উদ্ধৃত করে আমি যা লিখেছি তা যাচাই করতে দেখুন ফাতহুল বারী ২য় খন্ড , পৃষ্ঠা ১১ ও ১২ , প্রকাশক : দারুল হাদীস , কায়রো।

সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা না যথার্থ ব্যাখ্যা ?

লেখক এরপর লিখেছেন, মূলত ছহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে দেরী করে ছালাত আদায় করা হয়।

এ সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে। এরপর লেখক লিখেছেন , অনেক মসজিদে ফর্সা হলে ছালাত শুরু করা হয় এবং বিদ্যুত বা আলো বন্ধ করে কৃত্রিম অন্ধকার তৈরি করা হয়। এটা শরীয়তের সাথে প্রতারণা করার শামিল। হাঁ , অবশ্যই এটা প্রতারণা। লেখক স্পষ্ট করেননি , কারা এই কাজটি করে থাকে। কারণ , বিষয়টি এমনিতেই স্পষ্ট। এটা করে থাকে তারা যারা অন্ধকারে ফজর আদায় করাকে মুস্তাহাব বলে মনে করে। যারা ফর্সা করে ফজর আদায় করাকে মুস্তাহাব বলে মনে করে তারা এটা করবে না। তারা বরং উল্টোটা করবে। তারা অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে কৃত্রিম ফর্সা তৈরির চেষ্টা করবে।

মুহতারাম ,

লেখক এই অধ্যায়ে মূলত ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করা তথা তাগলীস বিল ফাজর যে মুস্তাহাব তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে চাইছেন। আপনি জানেন যে , কারও কারও মতে ফজরকে ফর্সা করে আদায় করা তথা ইসফার বিল ফাজর মুস্তাহাব। লেখক এই দ্বিতীয় মতটির পক্ষের হাদীসগুলোকে জাল প্রমাণ করতে চাইছেন। এ জন্য তিনি শুরুতেই হযরত মুআজ ইবন জাবাল রা .-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন যা দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করে। লেখক বলছেন , হাদীসটি জাল। আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ এই হাদীসকে তাঁদের মতের পক্ষে দলীল হিসাবে কোথাও উপস্থাপন করেছেন বলে আমার জানা নাই। এই মতের অনুসারীদের কেউ বিচ্ছিন্নভাবে এটিকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করলে করতেও পারে কিন্তু তার দায় দায়িত্ব এই মতের প্রবক্তাগণের উপর কিংবা এই মতের অনুসারীদের সকলের উপর চাপানোকে আমি ন্যায়সংগত মনে করি না।

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

اسفار سفر سفر

سفر الصبح

اسفر بلال دخل بلال فى سفر الصبح

اصبح بلال

فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون

إسفار أسفروا -

بالصبح 'با'- حرف الجر' (preposition) (متعدى)

transitive verb-

এরপর লেখক এই হাদীসের সমার্থক আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন । হাদীস দুটি ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ তাঁদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন । লেখক হাদীস দুটিকে সহীহ বলেছেন । কিন্তু তাঁর দাবি হল , ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ হাদীস দুটির অপব্যাখ্যা করে থাকেন । তাঁর এই দাবি প্রমাণ করার পূর্বে তিনি প্রসঙ্গত বলেছেন ,' 'হেদায়া ' কিতাবে প্রথম আলোচনায় সঠিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরে পৃথক আলোচনায় বলা হয়েছে , ويستحب الإسفار بالفجر 'ফর্সা করে ফজর ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব '। অথচ উক্ত ব্যাখ্যা চরম বিভ্রান্তিকর এবং ছহীহ হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধী। ' (দ্রষ্টব্য পুস্তকের ১২৫নং পৃষ্ঠা)

হেদায়া প্রণেতা কী বলেছেন আর মুযাফফর সাহেব কী বুঝলেন

মুহতারাম ,

লেখকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে , হেদায়া কিতাবটি বুঝতে লেখকের একটুখানি স্খলন ঘটে গেছে। কারণ , হেদায়া প্রণেতা সালাত অধ্যায়ে প্রথমে সালাতের মূল ওয়াক্তের বিবরণ দান করেছেন। কোন্ সালাতের ওয়াক্ত কখন শুরু হয় আর কখন শেষ হয় তার বিবরণ দান করেছেন। বলেছেন :

أول وقت الفجر إذا طلع الفجرالثانى وهو البياض المعترض فى الأفق و آخر وقتها مالم تطلع الشمس

এইভাবে প্রতিটি সালাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত বর্ণনা করার পর তিনি ভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রতিটি সালাতের মুস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ দান করেছেন । সেখানে তিনি বলেছেন, ويستحب الإسفار بالفجر 'এবং মুস্তাহাব হল ফজরকে ইসফার করা। ' লেখকের মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে , হেদায়া প্রণেতা পরষ্পর বিরোধী দুইটি কথা বলেছেন । অথচ কোনোটির সাথে কোনোটির বিরোধ নেই । তাছাড়া লেখক বলেছেন . হেদায়া কিতাবে প্রথম আলোচনায় সঠিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ......।

প্রশ্ন হল , লেখক তো ফজরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে আলোচনা করছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন , হেদায়া কিতাবে প্রথমে সঠিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি লেখকের মতে ফজরের

قَالَ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى الْإِسْفَارِ أَنْ يَّضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيْهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ تَـأْخِيْرُ الصَّلَاةِ

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه و سلم وَالتَّابِعِيْنَ اَلْإِسْفَارَ بِصَـلَاةِ الْفَجْـرِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحقُ مَعْنَى الْإِسْفَارِ أَنْ يَّضِحَ الْفَجْـرُ فَلَا يُشَـكُّ فِيْـهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ

غير واحد

উচিত। নইলে সেটাকে অসাবধানতাজনিত ভুল বলা যাবে না, ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি ও ধৃষ্টতা বলতে হবে।

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রাহিমাহুমুল্লাহ) রাফে‘ ইবন খাদীজ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে সম্পর্কেও কিছু কথা আছে। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। লেখক এরপরে ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তাহাবীর দুটি বক্তব্যের প্রথমটির অনুবাদ করতে গিয়ে লেখক বন্ধনী যুক্ত করে লিখেছেন, (উক্ত হাদীছের অর্থ হল)...। না, বক্তব্যটি হাদীসের অর্থ বা ব্যাখ্যা নয়। বরং এটি ইমাম তাহাবীর সিদ্ধান্ত। তিনি তাগলীস বিল ফাজর ও ইসফার বিল ফাজর সংক্রান্ত হাদীসসমূহের উপর পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। হাঁ উদ্ধৃত দ্বিতীয় বক্তব্যটিতে ইমাম তাহাবী হাদীসের অর্থ ও মর্ম ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তাহাবী রাহ. ও শায়খ আলবানী রাহ. উভয়ই ইসফার বিল ফাজর ও তাগলীস বিল ফাজর সংক্রান্ত সব হাদীসের আলোকে মত ব্যক্ত করে যা বলেছেন তার সার কথা হল, ফজরের সালাত শুরু করা উচিত অন্ধকারে এবং কিরাআত লম্বা করে শেষ করা উচিত ফর্সায়। এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানী রাহ. কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেননি।

লেখক এরপর ফজর ছালাতের সঠিক সময় শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, রাসূল (ছাঃ) কোন্ সময়ে ফজরের ছালাত আদায় করতেন, তা নিমেণর হাদীছগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। যে সকল হাদীস এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো বাহ্যত প্রমাণ করে যে, তাগলীস বিল ফাজর তথা অন্ধকারে ফজরের সালাত শুরু করা এবং অন্ধকার থাকতেই সালাত শেষ করা মুস্তাহাব। কিন্তু লেখক স্পষ্ট করেননি যে, তিনিও এইরূপ মত পোষণ করেন ও তদনুযায়ী আমল করেন, না তিনি ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানী রাহ. যা বলেছেন সেইরূপ মত পোষণ করেন ও তদনুযায়ী আমল করেন। ইসফার বিল ফাজর-এর প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা তা প্রমাণ করতে তিনি তো তাহাবী ও আলবানী (রাহিমাহুমাল্লাহ) -এর ব্যাখ্যাকেই পেশ করেছেন। বোঝা যায় যে, তাঁদের ব্যাখ্যাটি তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। কাজেই লেখকের আমলও ঐরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি ‘ফজর ছালাতের সঠিক সময়’ শিরোনামের অধীনে যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলোর সবই যেহেতু তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ তাঁদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি শায়খ আলবানীর তাকলীদ না করে এক্ষেত্রে এই মতই পোষণ করেন যে, ফজরের সালাত অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করা মুস্তাহাব।

[illegible]

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] مايعرفن [illegible] من الغلس [illegible] من الغلس [illegible] مُدرَجٌ مِنَ الرَّاوِىْ [illegible]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ ، يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ ، فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ ، تَعْنِي مِنَ الْغَلَسِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা বলেন , মুমিন নারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সংগে ফজরের সালাত আদায় করত অতঃপর তারা তাদের ঘরে ফিরে যেত , তাদেরকে কেউ চিনত না। তিনি (হযরত আয়েশা রা .) বোঝাতে চাচ্ছেন , অন্ধকারের কারণে।

হাদীসটির সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। হাদীসটিতে تعـنى শব্দটি আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে , من الغلس শব্দটি হযরত আয়েশার নয়। কারণ , تعـنى বা 'তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন ' কথাটি হযরত আয়েশার হতে পারে না। হযরত আয়েশার হলে শব্দটি হত أعنى অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি , অথবা এই জাতীয় কোনো শব্দই থাকত না। আসলে হযরত আয়েশা রা . এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন , مَا يُعْرَفْنَ বা فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (তাদেরকে চেনা যেত না বা তাদেরকে কেউ চিনত না)। পরবর্তী কোন রাবী মনে করেছেন যে , না চেনার কারণ হল , অন্ধকার । তাই তিনি ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছেন , হযরত আয়েশা বোঝাতে চাচ্ছেন , অন্ধকারের কারণে। এরপর আরও পরের কোন রাবী تعنى (তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন) শব্দটিকে বাদ দিয়ে من الغلس শব্দটিকে রেখে হাদীস বর্ণনা করেছেন । ফলে হয়ে গিয়েছে ما يعرفن من الغلس ।

উপরিউক্ত দাবি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

এই ইদরাজ তথা হাদীসের মধ্যে রাবী কর্তৃক হাদীসের কোনো অংশের ব্যাখ্যা বা মন্তব্য অন্তর্ভুক্তির ঘটনা কিছু হলেও ঘটেছে। আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী রাহ . আবূ হাতেমের সনদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে , ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন ,

كان وكيع يقول فى الحديث _ يعنى كذا وكذا _ وربما حذف "يعنى" وذكر التفسير فى الحديث

অর্থাৎ ওয়াকী ' (বিখ্যাত মুহাদ্দিস) হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন -অর্থাৎ এইরূপ এইরূপ - এবং অনেক সময় তিনি 'অর্থাৎ ' কথাটিকে অনুচ্চারিত রেখেছেন এবং হাদীসের মাঝে স্বীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী বলেন,

وكذا كان الزهرى يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبى – صلى الله عليه وسلم-

النكت على كتاب ابن الصلاح

تعنى

من الغلس

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَـالَتْ: " كُنَّا نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَـلَاةَ الصُّـبْحِ , مُتَلَفِّعَـاتٍ بِمُـرُوطِهِنَّ , ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ , وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

হাদীসটি পেশ করেছেন তা তাগলীস বিল ফাজরের পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় দলীল। হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে, وَالصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ (এবং ফজরের সালাত আদায় করতেন ফজর যখন উদিত হত তখন থেকে দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত।)

হাদীসটি তাগলীস বিল ফাজরের পক্ষে দলীল হয় না। কারণ, 'দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত' কথাটির অর্থ হল, ফর্সা হওয়া পর্যন্ত। হাদীসটির এক মর্ম হতে পারে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু করে দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত সালাত দীর্ঘ করে সালাত আদায় করতেন। তাই যদি হয় তাহলে তাগলীস বিল ফাজর মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় কী করে? তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের দাবি তো এই যে, অন্ধকারে শুরু করা এবং অন্ধকারেই শেষ করা মুস্তাহাব। অথচ হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত শুরু করতেন অন্ধকারে আর শেষ করতেন ফর্সা করে। হাদীসটির আরেকটি মর্মও হতে পারে। তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু করে দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতেন। কোনোদিন অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারে শেষ করতেন। কোনোদিন অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা করে শেষ করতেন। কোনোদিন ফর্সা করে শুরু করে ফর্সা করে শেষ করতেন। এই মর্ম গ্রহণ করলেও হাদীসটি দ্বারা তাগলীস বিল ফাজর মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় না।

পাঁচ নম্বরে উল্লেখকৃত লেখকের তৃতীয় দলীল

হযরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শেষে আছে وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করতেন অন্ধকারে।

হাঁ, এই হাদীস দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারে ফজর আদায় করতেন। তবে এই দলীল সম্পর্কে এই লেখার শেষ দিকে কিছু বলব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, লেখক হাদীসটির বরাত দিয়েছেন, 'সহীহ আবু দাউদ হা/৩৯৭। অথচ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে ও সহীহ মুসলিমেও আছে। (বুখারী হাদীস নং ৫৬৫, মুসলিম হাদীস নং ৬৪৬) কোনো হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে থাকলে তো কথাই নেই এতদুভয়ের কোন একটিতে

থাকলেও অন্য কিতাবের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলেও সঙ্গে বুখারী ও মুসলিমের বরাত অবশ্যই দেওয়া হয়। তার কারণ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবত লেখকের খবরই নেই যে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে। এই যদি লেখকের অবস্থা হয় তাহলে তাঁর মনে যা আসবে তাই তিনি লিখবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি সহীহ হাদীসের আলোকে আদায়কৃত সালাতকে, সাহাবী ও তাবেঈগণের সালাতকে জাল হাদীস দ্বারা আক্রান্ত মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক। থাকুক সে কথা। আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি।

ছয় নম্বরে উল্লেখকৃত লেখকের চতুর্থ দলীল

সহীহ বুখারীর এই হাদীস:

وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَايَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِأَةِ

অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত এমন সময়ে পড়তেন, যখন আমাদের কেউ পার্শে্ব বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত না, যাকে সে আগে থেকেই চিনে। তিনি ফজর ছালাতে ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করতেন। (লেখকের অনুবাদ)

ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের পক্ষে পেশকৃত আবূ বার্যাহ আসলামী রা. কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফেরই একটি হাদীসের সঙ্গে আলোচ্য হাদীসটির বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবূ বারযাহ আসলামী রা-এর হাদীসটিকে আমার এই লেখনীতে ইসফার বিল ফাজরের পক্ষে চতুর্থ দলীল হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই হাদীসটিতে বলা হয়েছে,

وّكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ

(এবং তিনি ফজরের সালাত সম্পন্ন করতেন যখন ব্যক্তি তার পার্শে্ব উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত।) এই বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় কী লেখক তা বলেননি। কেন বলেননি? এটিও তো বুখারীর হাদীস। তাহলে এটিকে আমলে না নিয়ে এটির বিরোধী হাদীসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন কি একদেশদর্শিতা নয়? আমরা অবশ্য এই বিরোধের নিষ্পত্তি কীভাবে হবে তা নিয়ে পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সাত নম্বরে উল্লেখকৃত লেখকের পঞ্চম দলীল

তা হল, সুনানে আবু দাউদের একটি হাদীস। যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করলেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ.فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِى مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « نَزَلَ جِبْرِيلُ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَنِى بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ». يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفر

يحسب باصابعه خمس صلوات

[illegible]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِى صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِى مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ

[illegible]

[illegible] ثم صلى مرة اخرى فاسفر بها [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তিনি যা বলেছেন তার এদিক সেদিক নিয়ে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। অবশিষ্ট ছিল হাদীসটির যে ব্যাখ্যা ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ করে থাকেন তা কি অপব্যাখ্যা -লেখক যেমনটা বলেছেন - না যথার্থ ব্যাখ্যা তা নিয়ে আলোচনা এবং লেখক যে ব্যাখ্যাটিকে সহীহ বলছেন তা কতটুকু সহীহ তা নিয়ে আলোচনা।

اسفروا بالفجر এর ব্যাখ্যা : তাদের ও প্রতিপক্ষের

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহিমাহুমুল্লাহ)কৃত যে ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি ইমাম তিরমিযী দিয়েছেন তা নানাবিধ কারণে প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে হয়।

কারণ, প্রথমত : ব্যাখ্যাটি হাদীসের স্পষ্ট শব্দানুগ নয়। শব্দ হতে প্রথমেই যা বোঝা যায় তা হল, তোমরা ফজরের সালাতকে ফর্সায় উপণীত কর। ফর্সা করে সালাত আদায় কর। এ সম্পর্কে পূর্বে আমি বিশদ আলোচনা করে এসেছি।

দ্বিতীয়ত : তাঁদের কৃত ব্যাখ্যাটির সার কথা হলো, তোমরা ফজর তথা সুবহে সাদিককে স্পষ্ট কর যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে। অর্থাৎ সুবহে সাদিক উদিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হও, তারপর সালাত আদায় কর। সুবহে সাদিক উদিত হয়েছে - এটা নিশ্চিত না হলে সালাত আদায় করো না। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে হাদীসে বর্ণিত -فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - (কারণ, তা সওয়াবের জন্য সর্বোত্তম বা তা বৃহৎ সওয়াব আনয়ণকারী -) রাসূলের এই কথাটির কোনো যথার্থতা থাকে না। কেননা, সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত না হয়ে সালাত আদায় করলে তো কিছুমাত্র সওয়াব হবে না, অধিক সওয়াব তো দূরের কথা। কারণ, তখন সালাত শুদ্ধই হবে না। আমল শুদ্ধ হবার পর আমলে সুন্নাত ও মুস্তাহাব জাতীয় কিছু সংযুক্ত হবার কারণে যখন আমলে অতিরিক্ত কিছু মাত্রা যোগ হয় তখনই তাতে অধিক সওয়াব লাভ হয়। আমল যদি শুদ্ধই না হয় তাহলে ঐ আমলের জন্য নির্ধারিত মূল সওয়াবই তো লাভ হবে না, অধিক সওয়াব আসবে কোত্থেকে? অথচ উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়ে সালাত আদায় করলে অধিক সওয়াব লাভ হবে আর নিশ্চিত না হয়ে সালাত আদায় করলে অধিক সওয়াব না হলেও আসল সওয়াব লাভ হবে। লক্ষ করলেন নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটির ফল কী দাঁড়াল? বিষয়টি একজন সাধারণ লোকেরও বোঝার কথা, আর আপনি তো অত্যন্ত মেধাবী আলেম।

مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ -

صحيح الإسناد

أَلْمَطَالِبُ

الْعَالِيَةُ

أَصْبِحُوْا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِهَا كَانَ أَعْظَمَ لِلأَجْرِ -

أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ كَـانَ أَعْظَمَ لِأُجُـوْرِكُمْ

فإنه أعظم للأجر

كلما أصبحتم بها كان أعظم للأجر

كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم

রাসূলের এই কথাগুলোর কোনো অর্থ থাকে না। জানি না তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ এই সকাল করবে ততই তা তোমাদের সওয়াব বৃদ্ধি

হাদীসের কী ব্যাখ্যা করবেন।

চতুর্থত : লেখক মুসনাদে তায়ালিসীর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা .-কে নির্দেশ দেন - أَسْفِرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَـرَى الْقَـوْمُ مَوَاقِـعَ نَبْلِهِمْ । লেখক শায়খ আলবানীর মন্তব্যও উল্লেখ করেছেন যে , শায়খ

আলবানী বলেন, وهذا إسناد صحيح إن شاء الله । আল্লাহ চাহেন তো এটি সহীহ সনদ ।

লক্ষ করুন , হাদীসটিতে বলা হয়েছে - সালাতে সুব্হকে এমনভাবে ইসফার বা আলোকিত কর , যেন লোকেরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীর কোথায় পতিত হল তা দেখতে পায়। হাদীসটি ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণেরই প ÿÿ যায়। ইসফার বিস্ সুবহের অর্থ যদি তেমনটাই হয় যেমনটা তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ বলেন , তাহলে এই হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় - তুমি সুবহে সাদিক এমনভাবে উদিত কর যাতে লোকেরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীর কোথায় পতিত হল তা দেখতে পায়। সুবহানাল্লাহ ! তাহলে অন্ধকারে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব তো দূরের কথা , বৈধ হওয়াই মুশকিল। কেননা , তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিক্ষিপ্ত তীর কোথায় পতিত হল তা দেখতে না পাওয়া গেলে তো সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত থেকে যাবে , নিশ্চিত হবে না। ফলে তার পূর্বে ফজরের সালাতও আদায় করা যাবে না।

এই হাদীসে আরেকটি বিষয় ল ÿ করম্নন । হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে بصلاة الصبح । الصبح বা الفجر শব্দ নয়। শেষোক্ত শব্দ দুটির অর্থ ‘সুবহে সাদিক ’ হতে পারে আবার ‘ফজরের সালাত ’ও হতে পারে কিন্তু প্রথমোক্ত শব্দটি শুধু ‘ফজরের সালাত ’ অর্থ নির্দেশ করে। তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ ইসফারের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই হাদীসের সাথে কোনোভাবেই মেলানো যায় না। কারণ , তাঁরা ইসফারের অর্থ করেছেন সুবহে সাদিক এমনভাবে স্পষ্ট হওয়া যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে। এখানে সুবহে সাদিকের কথা বলা হয় নি সালাতে সুব্হ বা ফজরের সালাতের কথা বলা হয়েছে। একে তো হাদীসটিতে এতটুকু ইসফারের কথা বলা হয়েছে যাতে নিক্ষিপ্ত তীরের গন্তব্যস্থল দেখতে পাওয়া যায় তার উপর আবার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ‘বিসালাতিস্ সুবহি ’। আর এ কারণেই তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ ইসফারের যে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাটি যে হযরত বেলালের এই হাদীসটির কারণেই অগ্রহণযোগ্য তা হাফেজ ইবন হাজার আসকালানীও স্বীকার

وَيَرُدُّهُ رِوَايَةُ إِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ ثَوِّبْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَـا بِلَالُ حَتّى يُبْصِـرَ الْقَـوْمُ مَوَاقِـعَ نَبْلِهِمْ

ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم

لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যাকে লেখক অপব্যাখ্যা বলেছেন। হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা কোনটি তা তিনি বলেননি। তিনি ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের ব্যাখ্যা ও ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানী রাহ.- এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের ব্যাখ্যা এবং ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানীর ব্যাখ্যা দুইটির মাঝে বিস্তর ভিন্নতা রয়েছে। এই উভয় ব্যাখ্যা একই সাথে সঠিক হতে পারে না। লেখক যদি একই সাথে এই উভয় ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করেন তাহলে ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যাকে কেন সঠিক মনে করবেন না? অথচ তাঁদের ব্যাখ্যাটি ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানীর ব্যাখ্যার কাছাকাছি। যা হোক, আমরা বোধ হয় প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের ব্যাখ্যা হাদীসটির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়। হাঁ ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানী রাহ. কর্তৃক কৃত ব্যাখ্যা হাদীসটির শব্দ ও ভাষার সঙ্গে মোটামোটি সংগতিপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের আলোকে বলতে হয় যে, ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যাই অধিক সংগতিপূর্ণ। দেখুন, হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রাহ. ইব্ন আবি শাইবার যে হাদীসটির প্রেক্ষিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের ব্যাখ্যাকে মারদূদ ও প্রত্যাখ্যাত বলেছেন সেই হাদীসটিতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم (ফজরের সালাতের ইকামত দাও হে বেলাল, এমন সময়ে যেন লোকেরা তাদের তীর কোথায় নিক্ষিপ্ত হল তা দেখতে পায়।) এতদ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসফার করেই ফজর শুরু করতে চাচ্ছেন। এই হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনায় نَـوِّرْ শব্দ রয়েছে যা أسـفر শব্দের সমার্থক। أسفر শব্দটিরই বহুবচন اسفروا। যা ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের পক্ষের প্রথম হাদীসের শব্দ। হাদীসটির অর্থ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এর অর্থ হল, তোমরা ফজরের সালাতকে ফর্সায় উপণীত কর। এর ব্যাখ্যা দুই রকম হতে পারে। এক: যেমনটা ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা ফজরের সালাতকে ফর্সায় শুরু করে ফর্সায় শেষ কর। দুই: যেমনটা ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানী বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা ফজরের সালাতকে অন্ধকারে শুরু করে ফর্সায় শেষ কর। সেই হিসাবে نَوِّرْ শব্দ সম্বলিত হযরত বেলাল রা.-এর হাদীসটিও এই দুই ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে বলে কেউ দাবি করতে পারে। কিন্তু মুহতারাম, আমার মতে হযরত বেলাল রা.-এর

হাদীসটি এই উভয় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কারণ , এখানে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত বেলালকে যে , তুমি ফজরকে ফর্সায় উপণীত কর । সম্বোধনটি সাধারণের উদ্দেশে নয়। বিশেষভাবে হযরত বেলালকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছু নয় যে , বেলাল যেন ফর্সা করে সালাতের একামত দেয়। যুহর সালাতের ক্ষেত্রে যেমন হযরত বেলালকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , أَبْرِدْ بِالظُّهْرِ (যুহরকে ঠান্ডায় উপণীত কর) অর্থাৎ ঠান্ডা হওয়ার পর যুহরের একামত দাও । এ ছাড়া ثوب শব্দটি স্পষ্টভাবেই আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে , হযরত বেলালকে ফর্সা করে সালাতের একামত দিতে বলা হচ্ছে। সুতরাং হাদীসটি ফর্সা করে সালাত শুরু করার পক্ষে শক্তিশালী দলীল হয় বলে আমি মনে করি এবং এই হাদীসটিই أسفروا শব্দ সম্বলিত হাদীসটির সম্ভাব্য দুটি ব্যাখ্যার মধ্য হতে ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যাকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ইমাম তাহাবী ও শায়খ আলবানীর ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। আল্লাহু আ ‘লাম।

মুহতারাম ,

ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ যে সকল হাদীসকে তাঁদের মতের পক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন লেখক তন্মধ্য হতে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীস দুটি সম্পর্কে তাগলীস বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে সুনানে নাসাঈ , মুসনাদে মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আল -আদানীর বরাতে আল -মাতালিবুল ‘আলিয়া ও ইব্‌ন হিববানের যে হাদীস তিনটির প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলোও ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের দলীল এবং সেগুলো তাঁদের তৃতীয় দলীল।

ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের চতুর্থ দলীল

বুখারী শরীফের হযরত আবূ বারযাহ আল আসলামী রা . -এর একটি লম্বা হাদীস । যেটিতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ আর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের সালাত সম্পন্ন করতেন যখন ব্যক্তি তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত । (সেহীহ বুখারী , হাদীস নং ৫৪৭)

[illegible]

[illegible]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا

[illegible]

[illegible]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قَالَ عَبْدُ اللهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ

[illegible]

[illegible]

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ

[illegible]

উল্লেখ্য, হাদীসটিকে ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের পক্ষে একটি শক্তিশালী দলীল বলে মনে করা হয়। ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ যে হাদীসকে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপনই করেন না সেইরূপ একটি জাল হাদীস অনুযায়ী আমল করার অভিযোগ উত্থাপন করে লেখক সেটিকে উদ্ধৃত করলেন অথচ ইসফারের পক্ষের এই হাদীসটিকে তিনি উল্লেখ করলেন না। লেখকের এই আচরণের কারণ অজ্ঞতা না জ্ঞানপাপিতা, তা বোঝা গেল না। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

মুহতারাম, তাগলীস বিল ফাজর ও ইসফার বিল ফাজর - এই উভয় মতের পক্ষের ও বিপক্ষের হাদীস, ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনার পর নিশ্চয়ই আপনি যথাযথভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন যে, ‘জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহর ছালাত’ নামক পুস্তিকাটির লেখক কতটুকু সত্যাশ্রয়ী, কতটুকু মিথ্যাশ্রয়ী। কতটুকু ন্যায়পরায়ণ, কতটুকু অবিমৃষ্যকারী ও হঠকারী। তাঁর তাহকীক ও গবেষণা কতটুকু জ্ঞাননির্ভর, কতটুকু অজ্ঞতানির্ভর।

দীর্ঘ আলোচনার ফসল

মুহতারাম, উভয় পক্ষের হাদীসগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসল তা সংক্ষেপে এই:

এক: হাদীসের ভান্ডারে ইসফার বিল ফাজর ও তাগলীস বিল ফাজর - এই উভয় সংক্রান্ত হাদীস পাওয়া যায় এবং সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ জাল হাদীসকে তাঁদের মতের ভিত্তি বানাননি।

দুই: ইসফার বিল ফাজর সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে উভয়বিধ হাদীস পাওয়া যায়। কওলী ও ফে‘লী। অর্থাৎ কিছু হাদীস এরূপ যেগুলো আমাদের জানান দেয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসফার করে ফজর আদায় করেছেন। আর কিছু হাদীস এরূপ যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসফার করতে নির্দেশ দান করেছেন। পক্ষান্তরে তাগলীস বিল ফাজর সম্পর্কে শুধু ফে‘লী হাদীস পাওয়া যায় কোনো কওলী হাদীস পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কাজের বিবরণী পাওয়া যায় সেসব হাদীসকে ফে‘লী হাদীস বলে। যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো উক্তি উদ্ধৃত হয় সেসব হাদীসকে কওলী হাদীস বলে।

তিন: ইসফার বিল ফাজর সম্পর্কে একাধিক সহীহ ও দ্ব্যর্থহীন হাদীস পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তাগলীস বিল ফাজর সম্পর্কে সহীহ ও দ্ব্যর্থহীন এই উভয় গুণসম্পন্ন হাদীস মাত্র একটি পাওয়া যায়। সেটি হল, লেখক কর্তৃক পাঁচ নম্বরে উল্লেখকৃত তাগলীসের পক্ষে তৃতীয় দলীল। যা হযরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত। তবে এই হাদীসটিও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারেই ফজর শেষ করেছেন। হাদীসটিতে শুধু ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ফজর আদায় করেছেন অন্ধকারে। তা সত্ত্বেও আমি হাদীসটিকে দ্ব্যর্থহীন বলেছি এইজন্য যে, হাদীসটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারে ফজর শুরম্ন করেছেন এটি নিশ্চিত কিন্তু অন্ধকারেই শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত নয়, তবে অন্ধকারে শেষ করেননি সে কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন হল, এই দুই প্রকারের হাদীসগুলোর মধ্য হতে আমলের জন্য উসূলের আলোকে কোন হাদীসগুলো অগ্রগণ্য? ইসফারের হাদীস না তাগলীসের হাদীস?

এর জবাব হল, শাস্ত্রীয় নীতি অনুযায়ী যে কোনোটাকে কেউ যদি গ্রহণ করে এবং সেটাকে মুস্তাহাব বলে তাহলে বলা যায় না যে, সে মুস্তাহাব পরিপন্থী কাজ করেছে। কারণ, সব কয়টির পক্ষে মুস্তাহাব হওয়ার সম্ভাব্য দলীল বিদ্যমান। প্রশ্ন হল, যদি কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে চাই তখন?

উত্তরে বলব, আপনি যদি নিবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে থাকেন এবং নিরপেক্ষ মস্তিষ্কে চিন্তা করেন তাহলে আপনিই বলবেন যে, শাস্ত্রীয় বিচারে ইসফারকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ, ইসফার বিল ফাজর সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে কওলী ও ফে‘লী উভয় প্রকার হাদীস রয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেমন ইসফার করে ফজর আদায় করেছেন তেমনি সাহাবায়ে কেরামকেও ইসফার করে ফজর আদায় করতে নির্দেশ দান করেছেন। পক্ষান্তরে তাগলীস বিল ফাজর সম্পর্কে শুধু ফে‘লী হাদীস পাওয়া যায়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাগলীস বিল ফাজর করেছেন -(এখানে তাগলীস বিল ফাজর বলে আমি শুধু বুঝাতে চাচ্ছি অন্ধকারে শুরু করাকে। সুতরাং অন্ধকারে শেষ করাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং ফর্সা করে শেষ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।) এই তথ্য তো হাদীসে পাওয়া যায় কিন্তু তিনি তাগলীস বিল ফাজর করতে নির্দেশ দান করেছেন - এইরূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আর ফে‘লী হাদীসের বিপরীতে যখন কওলী হাদীস পাওয়া যায় তখন কওলী হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ রাসূলের কর্মের বিপরীত কোন উক্তি বা

নির্দেশ পাওয়া গেলে তাঁর উক্তি বা নির্দেশকে তাঁর কর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর কারণ সহজবোধ্য। আর তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নির্দেশ দেন একরকম আর তিনি নিজে করেন অন্যরকম তখন এ ছাড়া আর বলার কিছুই থাকে না যে, নিশ্চয়ই স্বীয় নির্দেশের বিপরীত কর্ম সাধনের পিছনে বিশেষ কোনো কারণ নিহিত আছে। অন্য ভাষায় বললে, রাসূলের ফে‘ল বা কর্ম নানারকম ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কিন্তু উক্তি বা নির্দেশ কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তা পালনীয় বিধান বলে পরিগণিত হয়। অতএব যেখানে রাসূলের কর্ম হয় একরকম আর নির্দেশ হয় তার বিপরীত তখন তাঁর নির্দেশই অধিকতর অনুসরণযোগ্য। আলোচ্য বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্ধকারে ফজর আদায় করণের বিপরীতে ফর্সা করে ফজর আদায় করার না শুধু নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে বরং ফর্সা করে ফজর আদায় করা সম্পর্কে তাঁর কর্মেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তিনি উম্মতকে ফর্সা করে ফজর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন আবার নিজেও ফর্সা করে ফজর আদায় করেছেন । দেখুন ইসফার বিল ফাজরের পক্ষে পেশকৃত প্রথম তিনটি দলীল।

মুহতারাম,

আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতই তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। মসজিদে নববীতে যাঁরা ফজর আদায় করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁরাও সাধারণত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। সম্ভবত এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত সাধারণত অন্ধকারেই আদায় করতেন যাতে বিলম্বজনিত কারণে মসজিদে নববীতে সালাত আদায়কারী সাহাবীগণের কষ্ট না হয়।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারে ফজর আদায় করতেন - এই কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি এত অন্ধকারে ফজর শুরু করতেন যে, দীর্ঘ কেরাতে নামায আদায় করা সত্ত্বেও তা অন্ধকারেই শেষ হয়ে যেত। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রা.-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজর শুরু করতেন না যেমনটি তিনি করেছেন মুযদালিফায়। তাঁর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পরপরই ফজর শুরু করেছিলেন যা ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত। বুঝা যায় যে, তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিল, সুবহে সাদিক হওয়ার বেশ কিছু পরে সালাত শুরু করা। এদিকে লেখক কর্তৃক ছয় নম্বরে উল্লেখকৃত চতুর্থ দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে ৬০ থেকে

১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তো সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার বেশ কিছু পরে সালাত শুরু করে ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করলে ফর্সা হয়ে যাওয়ার কথা, অন্ধকার থাকার কথা নয়। অতএব, পাঁচ নম্বরে উল্লেখকৃত লেখকের তৃতীয় দলীল তথা হযরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

والصبح بغلس

(এবং তিনি ফজর আদায় করতেন অন্ধকারে)-এর মর্ম এটাই বলতে হবে যে, তিনি অন্ধকারে সালাত শুরু করতেন। অন্ধকারে শেষ করতেন কি না হাদীসটি তা ব্যক্ত করে না। হাদীসটিকে অন্ধকারে শেষ করার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বিশেষত যখন এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ফজরের সালাত সম্পন্ন করতেন যখন ব্যক্তি তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত। দ্রষ্টব্য, ইসফার বিল ফাজরের পক্ষে আমার এই লেখনীতে চতুর্থ দলীল হিসাবে উল্লেখকৃত হাদীস। আপনি বলতে পারেন যে, তাগলীস বিল ফাজরের পক্ষে উল্লেখকৃত চতুর্থ দলীলের হাদীসটি দ্বারা তো অন্ধকারেই শেষ করার কথা বুঝা যায়। এর জবাব হল, না তা বুঝা যায় না। কারণ, ঐ হাদীসটিতে শুধু এতটুকু ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত এমন সময়ে পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার পার্শ্বে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত না যাকে সে আগে থেকেই চেনে। কিন্তু না চেনার ঘটনাটা কখনকার, সালাত শেষের না সালাত শুরুর তা হাদীসে ব্যক্ত হয়নি। আপনি বলতে পারেন যে, ঐ হাদীসের জালীস শব্দ কি প্রমাণ করে না যে, ঘটনাটি সালাত শেষের? আমি বলব যে, জালীস শব্দটি দিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, ঘটনাটি সালাত শেষের। কারণ জালীস শব্দটি উপবিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কেই বলা হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। একই মজলিসে উপস্থিত পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। উপবিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহার হয়ে থাকলেও তা দ্বারা সালাত শেষের ঘটনা বুঝা যায় না। কারণ প্রথম রাকআতে উভয় সেজদার মাঝখানের সময়টিতেও উপবিষ্টতা পাওয়া যায়। দেখুন, ইসফার বিল ফাজরের পক্ষের চতুর্থ দলীলের হাদীসে কিন্তু স্পষ্টতই সালাত শেষের কথা ব্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে তাগলীস বিল ফাজরের পক্ষের চতুর্থ দলীলের হাদীসে এইরূপ স্পষ্ট কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। হাদীস দুইটি আবার দেখুন। তাগলীস বিল ফাজরের হাদীসে বলা হয়েছে وكان يصلى الصبح ==== *(তিনি সালাত আদায় করতেন),*

পক্ষান্তরে ইসফার বিল ফাজরের পক্ষের হাদীসটিতে বলা হয়েছে وكان ينفتل من صلاة الغداة

==== (এবং তিনি ফজরের সালাত সম্পন্ন করতেন)।

পূর্বে বলেছিলাম, হাদীস দুইটি সাংঘর্ষিক। বলেছিলাম, এই সংঘর্ষ নিরসনের উপায় কী তা নিয়ে পরে আলোচনা করব। পর্যালোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে আশা করি যে, হাদীস দুইটির মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনো সংঘর্ষ ও বিরোধ নেই। যে বিরোধ বোঝা যায় তা বাহ্যিক, প্রকৃত নয়। হাদীস দুইটির সমন্বিত মর্ম এক ও অভিন্ন। আর তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারে সালাত শুরু করতেন এবং ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করে যখন সালাত শেষ করতেন তখন ফর্সা হয়ে যেত।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ১৪৩১ হিজরীতে আমি সপরিবারে হজ্ব আদায় করতে যাই। মদীনা হতে জিদ্দায় আসার পথে এক জায়গায় এসে আমরা আসরের সালাত আদায় করলাম। এরপর চা নাস্তা গ্রহণ করার পর দেখলাম মাগরিবের সময় হতে মাত্র আধঘন্টা খানেক সময় বাকী আছে। ড্রাইভারকে বললাম, আমরা এখানেই মাগরিবের সালাত আদায় করে রওয়ানা হব। সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করতে থাকলাম । ফাঁকা মরুভূমি। কাজেই সূর্যাস্তের দৃশ্যটা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। সূর্য পুরোপুরি দৃশ্যের অন্তরালে চলে গেলে একমিনিট অপেক্ষা করলাম এবং একজনকে বললাম আযান দিতে। পথের ধারের ঐ সকল মসজিদে নিয়মিত মুয়াযি্যন ও ইমাম নিযুক্ত থাকেন না। আপনি তা ভালই জানেন। কাজেই আযান শেষে আমিই ইমামতি করলাম। দুই রাকআত সুন্নতও আদায় করলাম। সালাত শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হলাম তখন সেই মুহূর্তে আগত একটি বাসের যাত্রীরা বলাবলি করতে থাকল, ওয়াক্ত না হতেই মাগরিবের সালাতের জামাআত শেষ হয়ে গেল? আমি তাদের কথার কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। আমরা যখন সালাত শেষ করে বের হলাম তখন দেখলাম, পুরো মরুভূমি তখনও আলোয় পূর্ণ। তীর নিক্ষেপ করলে তীর কোথায় গিয়ে পড়ল তা স্পষ্ট দেখা যাবে। এটাই ছিল সমালোচনার কারণ। ঐ যাত্রীদের ধারণা অনুযায়ী আমরা ওয়াক্ত না হতেই সালাত আদায় করেছি। যা হোক আমি যুবায়েরকে বললাম, 'বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রাফে' ইবন খাদীজ রা. বলেন,

كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

অর্থাৎ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম, অতঃপর আমাদের কেউ ঘরে ফিরতে মসজিদ থেকে বের হত আর তখন সে তার নিক্ষিপ্ত তীরের আপতনস্থল দেখতে পেত। (বুখারী হাদীস নং ৫৫৯, মুসলিম হাদীস নং

১৪৭৩) দেশে আমরা সবসময়ই মাগরিবের আযানের পরপরই সালাত আদায় করে থাকি , কিন্তু সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর দেখি আমাদের চারপাশ এরূপ অন্ধকার হয়ে যায় যে , সেই অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত তীরের আপতনস্থল দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। হাদীসটির মর্ম ও বাস্তবতা এখানে বুঝলাম। আমরা সালাত শেষ করে বের হয়েছি কিন্তু এখনও দেখ কিরকম আলো বিরাজ করছে। এর কারণও তার নিকট ব্যাখ্যা করলাম। বললাম , সূর্য অস্ত যায় আমাদের দৃশ্যপট হতে কিন্তু সূর্যের অস্তিত্ব তো আর বিলুপ্ত হয় না। ফলে ভূপৃষ্ঠের মানুষের দৃশ্যপট হতে সূর্য অস্তমিত হলেও এবং ভূপৃষ্ঠ হতে সূর্যের সরাসরি আলো বা রোদ দূরীভূত হলেও আকাশের উঁচুতে সূর্য অস্তমিত হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর পর্যন্তও সূর্যের আলো ও রোদ্দুর বিদ্যমান থাকে। আর সেই আলোর রেশই ফাঁকা ও কঙ্করময় মরুভূমিতে বেশ কিছুসময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ফলে মাগরিবের সালাত যথাসময়ে আদায় করার পরও এতটুকু আলো বিদ্যমান থাকে যাতে নিক্ষিপ্ত তীরের আপতনস্থল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গাছপালা বিশিষ্ট ও ঘনবসতিপূর্ণ ভূপৃষ্ঠে ঐ ক্ষীণ আলো তার প্রভাব ফেলতে পারে না। ঐ জাতীয় স্থানে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অাঁধার নেমে আসে। ’

মুহতারাম ,

সূর্য উদিত হওয়ার কালেও একই জাতীয় ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ তখন ফাঁকা মরুভূমিতে একই কারণে খুব দ্রুত ভূপৃষ্ঠ আলোকিত হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ফজর শুরু করতেন তখন ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত সালাতে তেলাওয়াত করলে সালাত শেষ হতে হতে ফর্সা হয়ে যাওয়া অনিবার্য বলে মনে হয় , তখনও অন্ধকার বহাল থাকা কিছুটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

যা হোক , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণে ফজরের

সালাতকে অন্ধকার থাকতে শুরু করতেন । আর তা হল তাহাজ্জুদ আদায়কারী সাহাবীগণের

সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখা। বিলম্বজনিত কারণে তাঁদের যেন কষ্ট না হয় সেই দিকটা

বিবেচনা করেই অন্ধকারেই শুরু করতেন । দেখুন , তাগলীস বিল ফাজরের পক্ষে লেখক

কর্তৃক পাঁচ নম্বরে উল্লেখকৃত তৃতীয় দলীলের হাদীসটিতে আছে وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ ‘এবং এশা, যখন লোক বেশী হত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন আর লোক কম হলে

বিলম্ব করে আদায় করতেন ।’ লোক কম হলে বিলম্ব করতেন আরও কিছু লোক আসে কি না সেই

অপেক্ষায়। আর লোক বেশী হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যাতে তাঁদের কষ্ট না হয়। উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনায় রাখা রাহমাতুল লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেছেন, لولا أن أشق على أمتى لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل صـلاة ولأخـرت صـلاة العشـاء إلى ثلث الليل অর্থাৎ আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট চাপিয়ে দেওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে প্রত্যেক সালাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম এবং এশার সালাতকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩)

ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণ এই বিষয়টিকেও সামনে রাখেন এবং রাসূলের যে মোটিভ ছিল অন্ধকারে ফজর শুরু করার সেই মোটিভ অনুযায়ী তাঁরা আমল করেন। এইজন্য আমরা দেখি রামাদান মাসে তাঁরা ফজরের সালাতকে সুবহে সাদিকের ১০/১৫ মিনিট পরেই শুরু করেন। তথা অন্ধকারেই শুরু করেন। যাতে ইসফার করে শুরু করার কারণে মুসল্লীরা কষ্ট না পায়।

বলছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত ফজর অন্ধকারে শুরু করতেন এবং শেষ করতেন ফর্সা করে। কিন্তু উম্মতের জন্য তাঁর পছন্দ ছিল ইসফার করে শুরু করা। তিনি নিজেও ফর্সা করে শুরু করেছেন বলে হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ফর্সা করে শুরু করাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত বেশী বিলম্ব করে আদায় করতেন না। কিন্তু তাঁর পছন্দ ছিল এশার সালাতকে বিলম্ব করে আদায় করা। তিনি বলেছেন, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل অর্থাৎ আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট চাপিয়ে দেওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে প্রত্যেক সালাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম এবং এশার সালাতকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩) এই জাতীয় আরও হাদীস আছে। এইসব হাদীসের প্রেক্ষিতেই এশার সালাত বিলম্ব করে আদায় করাকে দল মত নির্বিশেষে সকলেই মুস্তাহাব বলে থাকেন।

তাহলে রাসূলের পছন্দের কারণে যদি ইসফার করে ফজর আদায় করাকে কেউ মুস্তাহাব বলে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

তবে ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের অভিমত হল, যদি কোনো ব্যক্তি অধিক দীর্ঘ কিরাআত করে সালাত আদায় করে তবে তার উচিত অন্ধকারে শুরু করা। যাতে সালাত শেষ হওয়ার পরও এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যেন কোনো কারণে সালাত ফাসেদ হয়ে গেছে জানতে পারলে পুনরায় সুন্নত কিরাআতের মাধ্যমে সালাত আদায় করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই সালাত শেষ করা যায়। আর এ কারণেই তাঁরা সাধারণত সূর্যোদয়ের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট পূর্বে ফজরের সালাত শুরু করেন। কারণ, তিওয়ালে মুফাস্সালের যে কোনো দুইটি সূরা দিয়ে দুই রাকআত সালাত শেষ করতে বড় জোর পনের মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। অতঃপর সালাত শেষে আরও পনের বিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট থাকে সূর্য উদিত হতে। অতএব আপনি ভেবে দেখুন কাদের আমল ইফরাত ও তাফরীত তথা ছাড়াছাড়ি ও বাড়াবাড়ি হতে মুক্ত, কাদের আমল অধিকতর মধ্যপথ আশ্রয়ী ও ন্যায়ানুগ, কাদের আমল সকল হাদীসের অধিকতর কাছাকাছি এবং অধিকতর সুন্নাহ সম্মত। মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেবদের না ইসফার বিল ফাজরের প্রবক্তাগণের?

আরও অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে বিধায় আলোচনা শেষ করছি। যতটুকু আলোচনা হয়েছে তদ্বারা একজন আলেম হিসাবে আপনি অনেক কিছুই উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

বলেছিলাম, পুরো বইটি সম্পর্কে কিছু মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরব। কিন্তু তাতেও এত সময় ও এত লেখার প্রয়োজন যে, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে অন্য কাজ জমা হয়ে আছে যা অল্প কয়েকদিনে শেষ করতে হবে। তবে বইটি প্রেরণ করে আপনি আমার হাতে একটি গবেষণার কাজ তুলে দিয়েছেন। এজন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা আছে, পুরো বইটির বক্তব্য নিয়ে এই নিবন্ধের মত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পর্যালোচনা করার। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন। আমরাও আপনার জন্য দুআ করছি এবং করতে থাকব।

মুহতারাম,

আপনি জানেন, বহু আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে একাধিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো ÿÿ ত্রে একটি মানসূখ বা রহিত এবং অপরটি নাসিখ বা রহিতকারী বলে উলামায়ে কেরাম চিহ্নিত করেছেন। কোনো কোনো আমলের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির সবকটিকেই উলামায়ে কেরাম সুন্নাহ বলে নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্য হতে কেউ একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেউ অপরটিকে এবং প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রত্যেকেই দলীলের আশ্রয় নিয়েছেন। দলীল ছাড়া ইচ্ছামত কেউ

কোনো পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেননি। সুতরাং কোনোটিকে তাচ্ছিল্য করা কিংবা কোনোটিকে প্রত্যাখ্যাত বা হাদীস বিরোধী বলা চরম অন্যায় এবং সুন্নাহ্ বিরোধী বক্তব্য।

নানাবিধ কারণে সালাতসহ শরীয়তের বহু মাস্আলা মাসায়েলে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতভেদ সাহাবী যুগেও ছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম কেউ কাউকে পথচ্যুত আখ্যায়িত করেননি। বলেননি যে, সে হাদীস বিরোধী আমল করছে।

শুধু সাহাবা যুগে নয় বরং রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ ঘটেছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই বলেননি যে, তোমার কর্মটি শরীয়ত বিরোধী বা আমার আদেশ ও সুন্নাহ বিরোধী হয়েছে। আপনি জানেন, খন্দকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিব্রাঈল আ. আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ, আমি তো অস্ত্র-শস্ত্র এখনও রাখিনি। আপনি ওদের উদ্দেশে বের হোন। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে? জিব্রাইল আ. বনু কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ দিকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরূদ্ধে অভিযানের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং হযরত বেলালকে ঘোষণা দিতে □□□□□-

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة

‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনূ কুরায়যায় গিয়েই আসরের সালাত আদায় করে।’

ঘোষণা শোনামাত্রই সবাই অস্ত্র হাতে রওয়ানা হলেন। অনেকেই সময়মত পৌঁছে গেলেন। কিছু সাহাবী পথে থাকা অবস্থাতেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন তাঁদের মাঝে মতভেদ হল যে, সালাত কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবী বললেন, আমরা সেখানেই সালাত আদায় করব যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে আমাদের নির্দেশ দান করেছেন। তথা বনূ কুরায়যায় গিয়ে। অন্যরা বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা সালাত কাযা করে হলেও বনূ কুরায়যায় পৌঁছেই সালাত আদায় করি। তো কিছু সাহাবী পথেই সালাত আদায় করে রওয়ানা হলেন, অন্যরা বনূ কুরায়যায় পৌঁছে সালাত আদায় করলেন তত ÿণে সূর্য ডুবে গেছে। পরবর্তীতে রাসূলকে ঘটনাটি জানানো হলে রাসূল কাউকেই তিরস্কার করলেন না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪১১৯; সহীহ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং ১৭৭০; সীরাতে ইবন হিশাম খন্ড ৬, পৃ. ২৮২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কোন দলকেই তিরস্কার করলেন না ? করলেন না এজন্য যে, দুই দলেরই উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের আনুগত্য। তবে একদল রাসূলের উক্তির উদ্দেশ্য কী ছিল সেদিকে দৃষ্টি দেননি। তাঁর উক্তির বাহ্য অর্থ অনুযায়ী অনুযায়ী আমল করেছেন। তা হোক, উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই বা করলেন কিন্তু বাহ্য অর্থে হলেও তাঁরা আমল তো করেছেন তাঁর উক্তি অনুযায়ী। অপর দল তাঁর উক্তির মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং তদনুযায়ী আমল করেছেন । বাহ্যত তাঁরা রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বাহ্যত রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করলেও প্রকৃত অর্থে তাঁরা রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করেননি। অতএব উভয় দলই স্ব স্ব স্থানে ছিলেন সঠিক। এ কারণেই রাসূল কাউকেই তিরস্কার করেননি। উভয় দলের আমলকেই গ্রহণযোগ্যতার সীমাভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। উভয় দলের মধ্য হতে কোন দলের আমলটি উত্তম ছিল তা স্বতন্ত্র এক আলোচ্য বিষয়। তবে একজন সাধারণ লোকের সামনেও যদি আপনি ঘটনার বিশদ বিবরণ দেন তাহলে সে বলবে দ্বিতীয় দলের আমলটিই উত্তম ও যথার্থ ছিল। কারণ, তাঁরা সালাতও কাযা করেননি আবার যথাসম্ভব দ্রুত বনূ কুরায়যায় পৌঁছেও গেছেন। এজন্যই আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাহ. ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছেন যাঁরা সালাত কাযা করেননি তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তাঁরা দুই সওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরা যেহেতু রাসূলের নির্দেশের বাহ্য অর্থ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং তাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের আনুগত্য তাই তারা মাযূর এবং এক সওয়াবের অধিকারী। (যাদুল মাআদ, খন্ড ৩, পৃ. ১১৮-১১৯)

বলছিলাম যে, সালাতসহ শরীয়তের বহু মাস্আলা মাসায়েলে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই মতভেদের কারণ একাধিক এবং এই মতভেদ নতুন নয়, সাহাবী যুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু দলীলভিত্তিক মতভেদকে কেউ কখনও কলহ বিবাদের উপলক্ষ বানাননি। দলীলভিত্তিক মতভেদ শুধু বৈধ নয় প্রশংসনীয়। মতভেদ তখনই নিন্দনীয় হয় যখন তা হয় দলীলবিহীন বা মতভেদকে যখন কলহ বিবাদের উপলক্ষ বানানো হয়। সাম্প্রতিক কালে শ্রদ্ধেয় মুযাফ্ফর বিন মুহসিনসহ বেশ কিছু আলেম চিরায়ত এই দালীলিক মতপার্থক্যকে কলহ বিবাদের উপলক্ষ বানাচ্ছেন। তাঁরা সহীহ হাদীসের আলোকে সালাত আদায় করার তথাকথিত আহবান জানিয়ে মূলত মতপার্থক্যের পরিধিকে আরও বিস্মৃত করে চলেছেন। কারণ, তাঁদের বক্তব্য হল, কারও অনুসরণ নয় সহীহ হাদীসের অনুসরণ কাম্য। কথাটি সত্য কিন্তু কথাটির ফল খারাপ। প্রত্যেকেই যদি নিজ গবেষণা অনুযায়ী সহীহ হাদীসের আলোকে সালাত আদায় করার চেষ্টা করে তাহলে যত ব্যক্তি তত মত সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাছাড়া তখন জনসাধারণ সালাত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। না তারা নিজেরা গবেষণা

করতে পারবে, না মুযাফ্ফর সাহেবদের অনুসরণ করতে পারবে। কারণ, মুযাফ্ফর সাহেবদের বক্তব্য তো এই যে, অন্য কারও অনুসরণ করা যাবে না। তাঁরাও তো সেই ‘অন্য কেউ’ এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসের অনুসরণ কাকে বলে, মতপার্থক্য দোষণীয় কি না, উম্মাহকে এক প্লাটফরমে কী করে আনা যায় ইত্যাদি বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা) । প্রবন্ধটি তিনি একটি সেমিনারে পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে তা পুসত্মক আকারে ‘উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা’ নামে প্রকাশিত হয়। সম্ভব হলে পুস্তকটি আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব। মনোজ্ঞ ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা সমৃদ্ধ ঐ পুস্তকটি পাঠ করলে শুধু জনসাধারণ নয় আলেম উলামাও প্রভূত উপকার লাভ করবেন এবং বহু প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এবং মনের সকল সন্দেহ ও সংশয় বিদূরীত হবে ইনশাআলস্নাহ।

আজ বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে ইরতিদাদের শিকার হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। নাস্তিকতাকে তারা যদি নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হত তাহলেও তার বিরূদ্ধে আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। নাস্তিকতাকে তারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানের বিরূদ্ধে তারা অনবরত বিষোদগার করে যাচ্ছে। অশ্লীল ভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেবরা তাঁদের সকল সংগ্রামী শক্তি ব্যয় করছেন সুন্নাহ সম্মত মতপার্থক্য বিদূরীত করণের পিছনে। সুন্নাহ সম্মত পন্থায় সালাত আদায়কারীকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়ার পিছনে। আর ইরতিদাদ ও নাস্তিকতার বিরূদ্ধে না তাদের কলম চলছে, না তাদের জিহবা চলছে। দুর্ভাগ্য এই জাতির, মহাদুর্ভাগ্য।

শেষ কথা

সালাতে দলীলভিত্তিক শাখাগত মতপার্থক্যের কারণে সালাত আদায়ের পদ্ধতিতে যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে আমি বিভেদ বলতে নারাজ। আমি এই পার্থক্যকে বৈচিত্র বলতে ইচ্ছুক, যে বৈচিত্র সালাতকে আরও সৌন্দর্যময় করে তোলে, ইসলামকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে। আপনি গোটা জগতকে বাদ দেন, শুধু পৃথিবীর দিকে তাকান। আপনি আপনার চতুর্পার্শ্বে ঐক্যের তুলনায় পার্থক্যই বেশী দেখতে পাবেন। পৃথিবীতে আছে জড়বস্ত্ত, উদ্ভিদ, প্রাণীকূল। কেন এই বিভেদ? সব কেন জড়বস্ত্ত হল না, সব কেন উদ্ভিদ হল না, সব কেন প্রাণী হল না? তারপর দেখুন, সব জড়বস্ত্ত একরকম নয়। কোনোটি পাথর, কোনোটি লোহা, কোনোটি সোনা কোনোটি রূপা, কোনোটি মুক্তা কোনোটি মানিক। আরও

কত শত রকমের পার্থক্য। উদ্ভিদ জগতেও ভিন্নতা বিদ্যমান। কোনোটি কান্ডবিশিষ্ট, কোনোটি লতাবিশিষ্ট। কোনোটি ফলজ, কোনোটি ঔষধি, কোনোটি এর কোনোটাই নয়। কোনোটি আম দেয় তো অন্যটি জাম দেয়। কোনোটি কাঁঠাল কোনোটি তাল। এরূপ হাজার রকমের পার্থক্য। প্রাণীকূল দেখুন। কোনোটি বাকশক্তিহীন, কোনোটি বাকশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টির সেরা মানুষ। কোনোটি গৃহপালিত, কোনোটি বন্য। আরও কত রকমের পার্থক্য। এক বাঘকে দেখুন। একটি চিতা তো অপরটি নেকড়ে কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। পাখী দেখুন। কত প্রজাতির পাখী । এই জীববৈচিত্রসহ নানারকম সৃষ্টি বৈচিত্র এই মাটির পৃথিবীকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। শৈল্পিক সৌন্দর্য দিয়ে তাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে। তদ্রূপ সালাত আদায়ের পদ্ধতিতে নানারকম দলীলনির্ভর পার্থক্য আমার চোখে বৈচিত্র হয়ে দেখা দেয়। আর সেই বৈচিত্রের মধ্যেও এক মহান ঐক্য আরও স্পষ্ট হয়ে বিশ্ববাসীকে চমকিত করে। মসজিদে নববীতে কিংবা হারাম শরীফে দেখি একজন সালাত আদায় করতে গিয়ে হাত বুকের উপর রাখে তো অপরজন নাভীর নীচে। আবার অপরজন আদৌ হাত বাঁধেই না, হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন আমীন বলে নিঃশব্দে তো অপরজন সশব্দে। একজন রাফয়ে ইয়াদাইন করে তো অপরজন করে না। এইরকম আরও কত পার্থক্য। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এইরকম বিপুল পরিমান পার্থক্যসহ সালাত আদায় করার পরও যখন দেখা যায় কেউ কারও সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে না বরং একে অপরের সঙ্গে উৎফুল্লচিত্তে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় হাতে হাত মিলিয়ে তার নিকট হতে বিদায় নিচ্ছে তখন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মহাদিগন্ত বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়। বৈচিত্রের মাঝে এক মহা ঐক্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য বলে মনে হয় এবং শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছা করে। আমি কবি নই। ফলে ভাষার তুলিতে এই বৈচিত্রের প্রকৃত চিত্র যথাযথ অাঁকতে পারলাম না। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটির এখানেই ইতি টানছি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। আমীন।

মা‘আস্সালাম

আপনার একামত্ম সেণভাজন

আব্দুল গাফফার, শহীদবাগ, ঢাকা (১৭ মে ২০১৪)

পুনশ্চ: আমার এই লেখাটির কোনো খসড়া আমি তৈরী করিনি। কাগজ কলম ব্যবহার না করে সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে কম্পিউটারে লেখাটি কম্পোজ করেছি। ফলে বিষয়বস্ত্তর দুর্বল উপস্থাপন কিংবা উপস্থাপনে কিছুটা ধারাবাহিকতার অভাব এবং ভাষাগত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তারপরও লেখাটি যদি আপনার আদেশ পালনে কিছুটা সফল হয়ে থাকে

إِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تَعَالَى إِنِّىْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

একটি অঙ্গীকার করেছি যে , নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে উপস্থিত হবে , আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে সেগুলোকে সংর ÿণ করবে না , তার জন্য আমার কোনো অঙ্গীকার নেই।

পর্যালোচনা

লেখক লিখেছেন , হাদীসটি উপমহাদেশীয় ছাপা আবূ দাঊদে নেই । আমার বক্তব্য হল , তা -ই যদি হয় তাহলে লেখকের উচিত ছিল হাদীসটির সনদ উল্লেখ করা। তিনি তো বইটি এইদেশীয় মুসলমানদের উদ্দেশে লিখেছেন । সনদ উল্লেখ করলে সকলের পক্ষেই সনদটি যাচাই করার সুযোগ হত এবং লেখকের সততার উপর প্রশ্ন উঠত না। হাদীসটিকে লেখক হাসান বলেছেন । হাসান লিযাতিহী , না লিগাইরিহী তা বলেননি। আমার মতে হাদীসটি যঈফ । কারণ, হাদীসটিতে বাকিয়্যাহ নামক একজন রাবী আছেন যিনি মুদাল্লিস । আর মুদাল্লিসের রেওয়ায়েত তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তিনি মারবী আনহু হতে শ্রবণ করেছেন বলে স্পষ্ট ভাষায় বলেন। যেমন বলেন , আমি অমুক থেকে শুনেছি। কিংবা বলেন , আমাকে অমুকে বলেছেন বা জানিয়েছেন । মুদাল্লিস যদি এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে , তিনি হাদীসটি মারবী আনহু হতে শুনেছেন না অন্য কোনো ব্যক্তি হতে শুনে তার নাম অনুচ্চারিত রেখে মারবী আনহুর নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন তখন তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। পরিভাষায় বলা হয় যে , মুদাল্লিস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন সে سماع -এর تصريح করে। যেমন বলে , سمعت فلانا يقول (আমি অমুককে বলতে শুনেছি) বা বলে , حدثنى فلان أو أخبرنى فلان (অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করেছে বা অমুকে আমাকে জানিয়েছে।) পক্ষান্তরে মুদাল্লিস যদি سماع -এর تصريح না করে, বরং قال فلان (অমুকে বলেছে) বা ذكر فلان (অমুকে বলেছে) বা عن فلان (অমুক হতে) -এই জাতীয় কোনো অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলোচ্য হাদীসটির বাকিয়্যাহ নামক রাবী মুদাল্লিস এবং তিনি عن শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন । আল্লামা ইবন হাজারের মতে তিনি صدوق كثير التدليس عن الضعفاء । ইব্ন মাঈন তাঁর সম্পর্কে বলেন ,

كان يحدث عن الضعفاء بمأة حديث قبل أن يحدث عن الثقة بحديث

[illegible]

إذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة

[illegible]

ضبارة بن عبد الله بن ابى سليك

[illegible]

[illegible]

عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى « وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ». قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِى فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى فَقَالَ « حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ ». وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ « صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا

[illegible]

[illegible]

আমার তাহকীক মতে হাদীসের ব্যাখ্যা কেউ কেউ এইভাবে করেছেন যে , ফাদালাহ রা .কে রাসূল প্রথমে সকল সালাতকেই আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ফাদালাহ রা . যখন বললেন, ঐ সময়ে আমার অনেক ব্যস্ততা থাকে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষভাবে ফজর ও আসরকে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটি লেখকের দাবির পক্ষে দলীল হয়।

কিন্তু এটি সম্ভাব্য একটি ব্যখ্যা। আরও ব্যাখ্যা হতে পারে। সেটি এই : সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া বা সালাতকে যথাযথ সংরক্ষণ করার অর্থ হল , সালাত নিয়মিত আদায় করা , সালাতের যাবতীয় হকসমূহের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করা। ফাদালাহ রা . যখন বললেন, ঐ সময়ে আমার ব্যস্ততা থাকে , ফলে অনেক সময় আমার পক্ষে সালাতের যথাযথ হক আদায় করা সম্ভব হবে না তখন রাসূল তাঁকে বিশেষভাবে ফজর ও আছরের

প্রতি যত্নবান হতে বললেন । এর নজীর আমরা সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতে পাই । যেখানে বলা হয়েছে حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (তোমরা সকল সালাতের প্রতি , বিশেষভাবে সালাতে উসতার প্রতি যত্নবান হও) এই আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকারগণ ঐ ব্যাখ্যাই

উল্লেখ করেছেন যা আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম ।

হাদীসটিতে যখন স্পষ্ট ভাষায় আউয়াল ওয়াক্তের কথা বলা হয়নি , আউয়াল ওয়াক্ত বুঝতে যখন হাদীসটির ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয় এবং সেই ব্যাখ্যাটিও চুড়ান্ত ব্যাখ্যা নয় , বরং সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তখন হাদীসটি দ্বারা দলীল গ্রহণ কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা আপনিই বিচার করুন।

যদি আমরা মেনেও নেই যে , হাদীসটিতে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের গুরুত্বই ব্যক্ত করা হয়েছে তবুও হাদীসটিকে সকল সালাতের জন্য প্রযুক্ত করা যায় না।

কারণ, এই হাদীস -নির্ভর দলীলটি عام বা সাধারণ ও নির্বিশেষ । সুতরাং তা خاص বা নির্দিষ্ট ও বিশেষ দলীলের মুকাবিলা করতে পারে না। দেখুন , এশার সালাত বিলম্বে

আদায় করা সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাব । কারণ, এশার সালাত বিলম্বে আদায় করার পক্ষে বিশেষ দলীল রয়েছে। অর্থাৎ যে দলীলটি বিশেষভাবে এশার সালাতের কথাই বলে। তদ্রূপ

যোহরের সালাত গ্রীষ্মকালে বিলম্ব করে আদায় করা সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাব । কারণ, এর পক্ষে বিশেষ দলীল রয়েছে। যে দলীলটি গ্রীষ্মকালে যোহরের সালাতকে

বিলম্ব করে আদায় করার কথা বলে। অতএব ফজরের সালাত ইসফার করে আদায় করার পক্ষে যখন বিশেষ দলীল পাওয়া যাচ্ছে তখন ফজরের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ দলীলটিই অগ্রগণ্য হবে।

একটি বই, একটি চিঠি : আযান ও ইকামত

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল গাফফার

[‘জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত’ নামের বইটি ‘ইলমী মুনাকাশা’র চেয়ে অপবাদ ও না-ইনসাফিরই উপর বেশি নির্ভরশীল। বইটির নাম থেকেই যা অনুমেয়। এর আরবী নামটিও বড় □□□□□□□-

صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقبضة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

নাম তো আক্রোশে ঠাসা, কিন্তু বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে শূন্য! আল্লাহর মেহেরবানী যে, এ বইয়ের একটি কপি জনৈক আলেমের হস্তগত হয়, যিনি হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের ভক্ত এবং এক সময় তার মুসল্লিও ছিলেন- তিনি তা মাওলানার কাছে পৌঁছান এবং এ বই সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের অনুরোধ জানান। এই অনুরোধকে গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে মাওলানা এ বিষয়ে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন, যা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের রূপ লাভ করে। বিষয়বস্ত্ত পুরোপুরি ইলমী ও সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও ভাষার সাবলীলতা ও পাঠ-মাধুর্য তাতে ব্যাহত হয়নি। ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার যতখানি হক আদায় করা সম্ভব তাতেও প্রবন্ধটি সফল, আলহামদু লিল্লাহ। পাঠকদের কাছে নিবেদন, চিঠিটি তারা চিন্তা সহকারে পড়বেন এবং বারবার পড়বেন। দলীলের বিশ্লেষণসহ ইখতিলাফি মাসায়েল অধ্যয়ন করে যারা অভ্যস্ত- ইনশাআল্লাহ তারা এতে সেই চাহিদা নিবারণের প্রচুর উপাদান পাবেন।

পূর্বে এ প্রবন্ধের কয়েকটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে তা বই আকারেও ছেপেছে ‘প্রচলিত সালাত কী জাল হাদীসের কবলে?’ এটি মাকতাবাতুল আযহার প্রকাশ করেছে। আলহামদু লিল্লাহ এর দ্বারা ব্যাপক ফায়েদা হচ্ছে। প্রবন্ধের এ

অধ্যায়টি আযান ও ইকামতের উপর। এর একটি অংশ এ সংখ্যায় ছাপা হল। বাকি অংশ আগামীতে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

(মুহাম্মাদ আবদুল মালেক)]

بسم الله الرحمن الرحيم

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মুহতারাম , বহুদিন পর আবার মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের বইটি নিয়ে বসলাম। এর পূর্বে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে তাঁর লেখা ও বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এর পরের অধ্যায়ে তিনি আযান ও ইকামত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যের এদিক সেদিক নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করব বলে আল্লাহর নামে লিখতে শুরু করলাম।

আযান ও ইকামত

এই অধ্যায়ের (১), (২), (৩) ও (৪) নং অনুচ্ছেদে তিনি যা লিখেছেন তাঁর সে লেখার উপস্থাপন ও বাকরীতি আমার পছন্দ না হলেও তাঁর মূল বক্তব্যের সাথে আমি মোটামুটিভাবে সহমত পোষণ করি। এক নম্বর শিরোনামে আযানের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি যঈফ। তিনি যেমনটা বলেছেন। তবে হাদীস যঈফ হলেই তা বর্ণনা করা যাবে না - বিষয়টি সেরকম নয়। লেখকের পুরো বই পাঠ করলে বুঝা যায় যে , লেখকের নিকট যঈফ ও জাল হাদীস একই পর্যায়ের। অথচ যঈফ ও জাল এক কথা নয়। যদি যঈফ ও জাল উভয়টি এক পর্যায়ের হত তাহলে মুহাদ্দিসগণ যঈফ ও জাল নামে দুটি পৃথক শ্রেণীতে হাদীসের শ্রেণীভেদ করতেন না। বরং এই উভয় প্রকার হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত বলতেন এবং একই শ্রেণীভুক্ত সাব্যস্ত করতেন। জাল হাদীস কোনো ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। কিন্তু যঈফ হাদীস কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এই জন্যই তাঁরা এই শ্রেণীভেদ করেছেন। কোন্ পর্যায়ের যঈফ হাদীস কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও বর্ণনাযোগ্য আর কোন্ ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য ও বর্ণনা -অযোগ্য এবং সব যঈফ হাদীস একই পর্যায়ের কি না -সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকা একজন গবেষকের জন্য খুবই জরুরি।

দুই, তিন ও চার নম্বর শিরোনামে যা বলা হয়েছে তা ঠিক আছে। মসজিদের বাম পার্শ্ব থেকে আযান দেওয়া এবং ডান পার্শেব দাঁড়িয়ে ইকামত দেওয়া জরুরি নয়। যে কোনো পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আযান ও ইকামত দেওয়া যাবে। আযানের পূর্বে দুআ দরূদসহ কোনো কিছু সংযোজন করাও বিদআত। ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’-এর জবাবে শুধু এই বাক্যটিই বলা উচিত। সঙ্গে ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ সংযোজন করা নিয়ম বহির্ভূত। আযান শেষে প্রথমে দরূদ পাঠ করবে, অতপর আযানের দুআ পাঠ করবে।

‘আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’-এর জবাবে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলার রীতি নিয়ে আলোচনা

পাঁচ নম্বর শিরোনামে ‘আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’-এর জবাবে ‘সাদাক্তা ওয়া বারার্তা’ বলার পক্ষে কোনো হাদীস না থাকার কথা লেখক যা বলেছেন তা ঠিক আছে। কিন্তু এর জবাবে কী বলতে হবে তা-ও স্পষ্ট করে কোনো হাদীসে বলা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আযানের জবাবে কী বলতে হবে সে সম্পর্কে কোনো কোনো হাদীসে সংক্ষেপে এতটুকু বলা হয়েছে যে, মুয়ায্যিন যা বলবে তদনুরূপ বলবে। আর কোনো কোনো হাদীসে বিশদ বিবরণ আকারে মুয়ায্যিনের কোন্ বাক্য শ্রবণ করে কী বলতে হবে তা নির্দিষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে মুয়ায্যিনের সব বাক্যের ক্ষেত্রেই অনুরূপ বলতে বলা হয়েছে কিন্তু ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ ও ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, এই বাক্য দুটোর পরে শ্রবণকারী বলবে, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’।

‘হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ’-এর জবাবে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলার কারণ

তার কারণ সম্ভবত এই যে, হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ ব্যতীত আযানের অন্যান্য বাক্যগুলো পরোক্ষভাবে সালাতের দিকে আহক্ষান, প্রত্যক্ষভাবে নয়। প্রত্যক্ষভাবে মূলত সেগুলো সত্য সাক্ষ্য প্রদান ও যিক্র। এইজন্য ঐসব বাক্যের ক্ষেত্রে মুয়ায্যিন যা বলবে তা-ই বলতে বলা হয়েছে। কিন্তু হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বাক্যদুটো যিক্র নয় বরং প্রত্যক্ষভাবে সালাতের প্রতি ও কল্যাণের প্রতি আহক্ষান। অতএব মুয়ায্যিন যখন বলবে, ‘হাইয়া আলাস্ সালাহ’ (সালাতের দিকে আস), ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ (কল্যাণের দিকে আস) তখন শ্রোতাও যদি

‘হাইয়া আলাস সালাহ’ ও ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলে তাহলে তা হবে অসংগতিপূর্ণ। এই জন্য এই বাক্যদুটোর জবাবে বলতে বলা হয়েছে, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত সাধ্য ও শক্তি নেই)। অর্থাৎ সালাত ও কল্যাণের দিকে গমন আল্লাহ তাআলার তাওফীক ব্যতীত সম্ভব নয়। মূলত সালাত ও কল্যাণের দিকে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার তাওফীক কামনা করার উদ্দেশ্যেই মুয়াযি্যনের ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ ও ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’র জবাবে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলার শিক্ষা দান করা হয়েছে।

আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাওম-এর জবাবে ‘ছাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলার অবকাশ আছে

এই নিরিখেই আমার বক্তব্য হল, ‘আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বাক্যটিও যিক্র নয়। বরং বাক্যটি একটি সত্যের ঘোষণা যে, ‘নিদ্রা অপেক্ষা সালাত উত্তম’। এই কথাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিদ্রা পরিহার করে সালাতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেই ফজরের সালাতের আযানে এই বাক্যটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাক্যটি সালাতের প্রতি আহক্ষানও নয় আবার যিক্রও নয়। বাক্যটি একটি বিবৃতিমূলক বাক্য, একটি সত্য সংবাদ। অতএব প্রথম প্রকার হাদীসের দাবি অনুযায়ী মুআযি্যনের ‘আস্-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’-এর জবাবে আস্-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলাই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার হাদীসে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলার যে তাৎপর্য উল্লেখ করলাম সেই তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বাক্যটির জবাবে বাক্যটির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অন্য কোনো বাক্য বলারও অবকাশ আছে বলে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে হাদীসে যেহেতু স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি তাই ‘আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’-এর জবাবে অন্য কিছু বলাকে সুন্নত বলে সাব্যস্ত করা যায় না। তবে অন্য কিছু বলাকে না জায়েযও বলা যায় না বলে আমি মনে করি। মুয়াযি্যন যখন ‘আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলে তখন মুয়াযি্যনের এই কথার সমর্থন করে কখনও কখনও ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলার মাধ্যমে তাকে সাধুবাদ জানানোর অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি।

দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে একবার একজন

মুয়াযি্যনকে আযান দিতে শুনলেন। মুয়াযযিন যখন বলল, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, عَلَى الْفِطْـــرَةِ (স্বভাব দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত) এরপর সে যখন বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ (তুমি আগুন হতে বের হয়ে গেলে)।১ এই হাদীস দ্বারা মুয়াযযিনের আযানের কোনো বাক্যের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোনো কিছু বলার অবকাশ বের হয়ে আসে। আমি শুধু অবকাশের কথা বলছি। সাদাকতা ওয়া বারারতা বলাকে নিয়মিত আমলে পরিণত করার কথা বলছি না। কারণ, তা হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়।

ঠিক এই একই যুক্তিতে ইকামতের জবাব দিতে গিয়ে 'কাদকামাতিস সালাহ'-এর জবাবে 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলার অবকাশ বের হয়ে আসে। কারণ, 'কাদকামাতিস সালাহ' বাক্যটিও একটি সংবাদ, প্রত্যক্ষভাবে সালাতের প্রতি আহক্ষানও নয় এবং যিকরও নয়। বিশেষত কথাটি যখন একটি হাদীসে আছে। হাদীসটি যঈফ হলেও তার সনদে মাতরূক বা মুত্তাহাম কোনো রাবী নেই। হাদীসটিকে মুনকার বলার মত অন্য কোনো কারণও বিদ্যমান নেই। হাদীসটির দুইজন রাবী শাহ্র ইবনে হাওশাব ও মুহাম্মাদ ইবনে ছাবেত যঈফ কিন্তু চরম পর্যায়ের যঈফ নয়। হাঁ এই দুইজন রাবীর মাঝখানে একজন মুবহাম (নাম অনুল্লেখিত) রাবী আছেন। আর মুবহাম রাবীর হাদীসকে যঈফ বলা হয় এ কারণে নয় যে, সে যঈফ রাবী। তার হাদীসকে যঈফ বলা হয় এজন্য যে, তার সম্পর্কে ভালো মন্দ কিছুই জানা যায় না। হতে পারে সে নির্ভরযোগ্য আবার এও হতে পারে যে, সে অনির্ভরযোগ্য। তার নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা উভয়টিই সম্ভাব্য, নিশ্চিত নয়। এই কারণে তার হাদীসটি মূলত ঝুলন্ত পর্যায়ের। তার বর্ণিত হাদীসকে চোখ বন্ধ করে যেমন গ্রহণ করা যায় না, তেমনই বর্জনও করা যায় না। যেহেতু তার হাদীসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না ফলে কার্যত তা দলীলযোগ্য হয় না। এটাকেই ব্যক্ত করা হয় যঈফ শব্দ দ্বারা। কিন্তু সত্তাগতভাবে তার হাদীস যঈফ নয় বরং প্রাসঙ্গিক কারণে তার হাদীস শুধু আমল-অযোগ্য। অতএব যদি হাদীসটির সমর্থনে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা লক্ষণ মেলে তবে তার হাদীসের উপর আমল করতে বাধা থাকার কথা নয়। এখানেও আমরা হাদীসটির সমর্থনে একটি গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। এজন্য হাদীসটির উপর আমল করাতে তেমন দোষের কিছু দেখছি না।

ছয় নম্বর শিরোনামে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে শাহাদত আঙ্গুলে চুম্বন করে চোখ মাসাহ করা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা ঠিক আছে। এই আমলের পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ সম্পর্কে যে হাদীসটির বর্ণনা পাওয়া যায় তা জাল।
সাত নম্বর শিরোনামে যা বলা হয়েছে তা-ও সঠিক। আযানের পরে দুআ পাঠকালে হাত উঠানোর

কোনো নিয়ম নেই। আযানের শেষে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলারও কোনো নিয়ম নেই।

আযানের দুআ ও তার তরজমা

আট নম্বর শিরোনামে আযানের দু‘আয় বাড়তি অংশ যোগ করা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা-ও ঠিক আছে। পূর্বেই যেমনটা বলেছি যে, এসব ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করলেও তাঁর উপস্থাপন ও বাকরীতি আমার পছন্দ নয়। সহীহ হাদীস অনুসারে আমলের প্রতি দাওয়াতদানই যদি লেখকের মিশন হয় তাহলে বলব যে, তাঁর বাকরীতি দাওয়াতী মিশনের সাথে অসংগতিপূর্ণ। লেখক বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন বলে আশা করি। যা হোক, সহীহ হাদীস অনুযায়ী আযানের দু‘আটি এইরূপ :

اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَه.٢

কিন্তু এর যে তরজমা মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব করেছেন তাতে একটু ভুল আছে। উল্লেখ্য, এই তরজমাটিই রেডিও ও টেলিভিশনে আযানের পরে প্রচারিত হয়। মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব রেডিও ও টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত এই তরজমাটিরই অনুসরণ করলেন কি না জানি না। তরজমাটি হবে এইরূপ :

‘এই পরিপূর্ণ আহক্ষান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন অসীলাহ ও মর্যাদা। এবং তাঁকে পৌঁছে দিন মাকামে মাহমূদে, যার ওয়াদা আপনি করেছেন।

আন্ডার লাইন করা অংশটি লক্ষ করুন। মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব ভুলটা এখানেই করেছেন। তিনি তরজমা করেছেন : ‘হে আল্লাহ, আপনিই এই পরিপূর্ণ আহক্ষান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু।’ তিনি رَبَّ শব্দটিকে predicate বা বিধেয় বানিয়ে দিয়েছেন। অথচ শব্দটি বিধেয় হলে শব্দটি হত رَبُّ (‘বা’ হরফটিতে পেশসহ), رَبَّ (‘বা’ হরফটিতে যবরসহ) নয়। আর তখন subject-এরও উল্লেখ থাকত। মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব তরজমায় সাবজেক্ট উল্লেখ করেছেন। আর তা হল ‘আপনিই’। কিন্তু দু‘আটিতে সাবজেক্টের উল্লেখ

নেই। আসলে رَبَّ শব্দটি اللهُمَّ। শব্দটির মধ্যকার আল্লাহ শব্দের بدل (বা apposition. যেমন : Akram Ahmed, principal of our collage is a reputed person. ‘principal of our collage’ কথাটি Akram Ahmed এর بدل বা apposition)। এজন্যই আমি মনে করি বাক্যটির যথার্থ তরজমা ঐটিই যা আমি উল্লেখ করেছি। যদিও প্রচলিত তরজমাটির বক্তব্য সঠিক, কিন্তু দু ‘আটিতে কথাটি যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তরজমায় তা ফুটে ওঠেনি। এই তরজমা দু ‘আটির ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনাকে বিনষ্ট করে দেয়। কাজেই বিশুদ্ধ তরজমাই করা উচিত। বিশেষ করে মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেবের মত ব্যক্তির কাছ থেকে ভুল নয়, বিশুদ্ধ তরজমাই কাম্য।

ইকামতের বাক্যগুলো দু’বার করে না একবার করে

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব এ ক্ষেত্রে শিরোনাম লিখেছেন এইভাবে : ‘ইক্বামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া দেওয়ার পক্ষে গোঁড়ামী করা’

এই শিরোনামের মধ্যে ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে দেওয়ার পক্ষে বরং তাঁরই গোঁড়ামির সন্ধান মেলে। হাদীস যখন দুই পক্ষেই আছে যেমনটা তিনি স্বীকার করেছেন তখন কোনো পক্ষেরই গোঁড়ামি করা উচিত নয়। যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার পক্ষপাতী তাঁরা যদি একবার করে যাঁরা বলেন তাঁদের বিরূদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতেন তাহলে তা হত গোঁড়ামি। তিনি যদি বলেন, সবসময় ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলা এবং কখনও একবার করে না বলাটাই গোঁড়ামি তাহলে তাঁর নিকট আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা কি মাঝেমধ্যে ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলে থাকেন? আমার এবং অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো এই যে, যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার পক্ষপাতী তাঁরা কখনও দুইবার করে বলেন না। তাহলে সেটাও তো আপনার চিন্তাধারা অনুযায়ী গোঁড়ামি হল। তাহলে গোঁড়ামির অভিযোগের তীর শুধু তাঁদের দিকে কেন ছুঁড়ে দিলেন যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার পক্ষপাতী?

এই শিরোনামের শুরুতে তিনি লিখেছেন : ইক্বামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয। এর পক্ষে দু’ একটি হাদীছ রয়েছে। কিন্তু এর উপর যদিও গোঁড়ামী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ, ইক্বামত একবার করে বলাই উত্তম। এর পক্ষেই বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যাক লেখক স্বীকার করলেন যে , ইকামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয। দুই একটি হলেও এর পক্ষে হাদীস আছে এটাও তিনি স্বীকার করলেন। এতে অন্তত এতটুকু স্বস্তি পাওয়া গেল যে , এই দেশের ইকামত জাল হাদীসের কবলে পড়েনি।

লেখকের মতে ইকামতের শব্দগুলো দুইবার করে বলার পক্ষে দুই একটি হাদীস আছে। আর একবার করে বলার পক্ষেই বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি কি তা -ই? তাহলে লেখক একবার করে বলার পক্ষে মাত্র দুইটি হাদীস উল্লেখ করলেন কেন ?

মুহতারাম , একে তো তিনি মাত্র দুইটি হাদীস উল্লেখ করেছেন , তাও আবার দ্বিতীয়টি ‘সহীহ ’ নয়। বেশির চেয়ে বেশি হাদীসটিকে হাসান বলা যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে লেখকের আশ্রয়পুরুষ আলবানী সাহেবও হাদীসটিকে হাসান পর্যায়ের উপরে নিতে পারেননি। তো এই কি ইকামত একবার করে বলার পক্ষে বেশি হাদীস থাকার নমুনা ?

হাদীস দুইটি উল্লেখ করার পর লেখক লিখেছেন : জ্ঞাতব্য : ইক্বামতের শব্দগুলো একবার করে বলা যাবে না বলে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা জাল। এরপর তিনি তাযকিরাতুল মাওযুআত থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমার বক্তব্য হল , ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা যাবে না - এই কথা কোনো ফকীহ বা মুহাদ্দিস বলেছেন বলে আমার জানা নাই । এমনকি সাধারণ কোনো লোকের মুখেও এরূপ কথা উচ্চারিত হয়েছে বা হয় বলে আমার জানা নাই । তারপর ঐ কথার পক্ষে আবার জাল হাদীস বর্ণনা করা তো অনেক দূরের ব্যাপার । লেখক ‘প্রচলিত ’ শব্দটির অর্থ কী তা জানেন না বলে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ এখানে বিদ্যমান । প্রচলিত জাল হাদীসের একটি উদাহরণ হল এই হাদীস : أول ما خلق الله نوري (আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে আমার নূর ।) এটি একটি জাল হাদীস এবং অনেককেই হাদীসটি বলতে শোনা যায়। প্রচলিত অর্থ - চালু থাকা , চলন্ত থাকা। কিতাবে কোনো জাল হাদীস থাকলেই তাকে প্রচলিত বলা যায় না। মানুষের মাঝে এর চর্চা যদি না থাকে। যা হোক , এরপর তিনি আরেকটি জাল হাদীস এনেছেন হযরত বেলাল রাযি . জোড়া জোড়া শব্দে আযান ও ইকামত দিতেন মর্মে। লেখকের বিপক্ষ -মতপোষণকারীরা হাদীসটিকে কোথায় দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লেখক তা বলেননি। ইকামতের শব্দগুলো দুইবার করে দেওয়ার পক্ষে দু -একটি

হাদীস আছে বলে লেখক বলেছেন। অথচ সেই দু-একটির একটাও উল্লেখ না করে তিনি একটি জাল হাদীস উল্লেখ করলেন। লেখকের আমানতদারী ও বিশ^স্ততা এখানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অবশ্য এটা নতুন নয়, পূর্বেও বারবার তাঁর আমানতদারী প্রশ্নবিদ্ধ হতে আমরা দেখেছি। কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় এইরূপ খিয়ানত যে কত মারাত্মক তা আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

আপনি জানেন, একসময় প্রায় প্রতিটি বিষয়ে দাজ্জালদের কর্তৃক অথবা দাজ্জাল বর্ণনাকারীদের পক্ষ হতে জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শরীয়ত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, আকীদা-বিশ্বাসসহ হেন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে হাদীস রচনা করা হয়নি। নানা কারণে, নানা রকম উদ্দেশ্যে হাদীস রচিত হয়েছে। এমনকি বেগুন বিক্রেতা তার বেগুনের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য সনদসহ হাদীস বর্ণনা করা শুরু করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ (বেগুন সর্বরোগের মহৌষধ)। তবে মুহাদ্দিসগণ সেসব জাল হাদীসকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এবং মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসের সংকলনের ন্যায় জাল হাদীসেরও সংকলন তৈরি করেছেন। যাতে মানুষ কোন্টি জাল হাদীস কোন্টি সহীহ হাদীস তা সহজেই জেনে যেতে পারে। তো মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব যেসব মত পোষণ করেন জাল হাদীসের কিতাবে তালাশ করলে সেসবের পক্ষেও বহু জাল হাদীস পাওয়া যাবে। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের পোষিত মত উল্লেখ করে কেউ যদি জাল হাদীসের ঐ সকল কিতাব হতে ঐ মতের পক্ষে একটি জাল হাদীস উল্লেখ করে, আর বলে যে, এই মতটি জাল হাদীসের কবলে আক্রান্ত তাহলে মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব কী জবাব দেবেন? তিনি যে জবাব দেবেন সেই একই জবাব প্রযোজ্য হবে এ দেশে প্রচলিত অনেক মাসআলা-মাসায়েলের পক্ষে তাঁর কর্তৃক জাল হাদীস উল্লেখ করণের ক্ষেত্রে।

লেখক যেহেতু ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার পক্ষে একটি হাদীসও উল্লেখ করেননি সেহেতু আমি আপনার জ্ঞাতার্থে সেসব হাদীস উল্লেখ করে আলোচনা পর্যালোচনা করতে চাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে যদিও হাদীসগুলো শুধু উল্লেখ করলেই চলত কিন্তু যেহেতু ইন্টারনেটে কোনো একজন লা মাযহাবী ভাই (সম্ভবত তিনি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেবই হবেন) সেসব হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন সেহেতু হাদীসগুলোর এদিক সেদিক নিয়ে এবং ঐ বন্ধুর আপত্তিগুলোর যথার্থতা কতটুকু তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করছি।

সূচনা কথা

মুহতারাম , আপনি জানেন যে , পূর্বে আযানের প্রচলন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে , কীভাবে সহজ পন্থায় লোকজনকে জামাআতে উপস্থিতির জন্য আহক্ষান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিলেন যে , আগুন জ্বালিয়ে জানান দেওয়া হোক - জামাআত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কেউ পরামর্শ দিলেন , নাকূস (একজাতীয় ঘণ্টা , কেউ বলেন, শিংগা) বাজিয়ে জানান দেওয়া হোক যে , জামাআত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো যেহেতু ইহুদী নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। হযরত উমর রাযি . পরামর্শ দিলেন , الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ। (সালাতের জামাআত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে) বাক্য দ্বারা মানুষকে আহক্ষান

জানানো হোক । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শটি গ্রহণ করলেন এবং হযরত বেলাল রাযি .-কে নির্দেশ দিলেন এই বাক্যটি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে মানুষকে সালাতের জামাআতে উপস্থিত হতে আহক্ষান জানাতে। কিছুদিন এই অনুযায়ী আমল চলার পর অবশেষে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিক্ষহী রাযি . একদিন স্বপ্নে দেখলেন , একজন লোক হাতে নাকূস নিয়ে যাচ্ছে। তিনি লোকটিকে অনুরোধ করলেন নাকূসটি তাঁকে দিতে। লোকটি জিজ্ঞেস করল , তুমি এটা দিয়ে কী করবে ? আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রাযি . বললেন, আমি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের

জন্য আহক্ষান জানাব । লোকটি বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা

দিচ্ছি। এরপর লোকটি আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করল এবং বলল , তুমি এই বাক্যগুলো দিয়ে মানুষকে সালাতের প্রতি আহক্ষান জানাবে। লোকটি এরপর ইকামতের বাক্যগুলোও

শিক্ষা দিল । পরদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিক্ষহী স্বপ্নটির বৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি এটাকে অনুমোদন দান করলেন এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদকে বললেন আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো বেলালকে শিখিয়ে দিতে। কেননা , তাঁর গলার স্বর ছিল আব্দুল্লাহ ইবন

যায়েদ অপেক্ষা উচ্চতর । এরপর থেকে সেই অনুযায়ী হযরত বেলাল রাযি . আযান ও ইকামত

দিতে থাকলেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আবদি রাবিক্ষহী রাযি .-এর ঐ স্বপ্নের বাক্যগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আযান

ও ইকামতের বাক্য হিসেবে অনুমোদিত হওয়ার কারণে তা শরীয়তের বিধানরূপে বিধিবদ্ধ

হয়ে গেল।

আযানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্বারা বোঝা গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিক্ষহী স্বপ্নে যে বাক্যগুলো শিখেছিলেন সেই বাক্যগুলোই আযান ও ইকামতের বাক্যরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং হযরত বেলাল রাযি. ঐ বাক্যগুলো দ্বারাই আযান ও ইকামত দিতেন।

অনুসন্ধানের বিষয় হল, আযান ও ইকামতের সেই বাক্যগুলো কী ছিল? তো আমরা হাদীসের ভা-ার তালাশ করে দেখতে পাই যে, যে বাক্যগুলো দ্বারা বর্তমানে সারা বিশ্বে আযান দেওয়া হচ্ছে এই বাক্যগুলোই হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিক্ষহীর স্বপ্নে দেখা আযানের বাক্য ছিল। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে ইকামতের বাক্যগুলো কী ছিল সে ব্যাপারে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

একরকম বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইকামতের বাক্যগুলো ছিল একবার করে। অর্থাৎ শুরুতে দুই জোড়া আল্লাহু আকবার এর পরিবর্তে ইকামতে এক জোড়া আল্লাহু আকবার। অতপর ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’, ‘হাইয়া আলাস সালাহ’, ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ একবার করে; এরপর ‘কাদ কামাতিস সালাহ’ দুইবার, ‘আল্লাহু আকবার’ দুইবার এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ একবার।

আরেক রকম বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইকামতের বাক্যগুলো ছিল ‘কাদ কামাতিস সালাহ’ বাক্যটিসহ আযানের অনুরূপ দুইবার করে।

জোড়া বাক্যে ইকামত দেওয়ার পক্ষে দলীল

দলীল-১

আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রাযি.-এর দেখা স্বপ্নে ইকামতের বাক্যগুলো ছিল দুইবার করে

জোড়া বাক্যে ইকামত: হাদীস-১

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَـالَ حَـدَّثَنَا اَصْـحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلخ

[illegible]

[illegible]

সম্পর্কে এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে না যে, তিনি নির্ভরযোগ্য কি না। তারপরও দেখুন, মাত্র একজন সাহাবী নয় বরং আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা বলছেন যে, বহু সাহাবী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। এর পরও কি কোনো সন্দেহ উত্থাপন করা যায়? তার পরও আপত্তিকারী দ্বিতীয় আরেকটি পন্থা অবলম্বন করেছেন । তিনি বলেছেন, আ‘মাশ মুদাল্লিস এবং তিনি ‘আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি যঈফ।

মুহতারাম, এই জাতীয় মূর্খতাপ্রসূত কথা নিয়ে আলোচনা করার অর্থ হল সময় নষ্ট করা। আরে ভাই আপত্তিকারী! আ‘মাশের ‘আন দ্বারা বর্ণনা যদি হাদীস যঈফ হওয়ার কারণ হয় তাহলে বুখারী ও মুসলিমের একটি নয়, দুটি নয়, প্রচুর হাদীস যঈফ বলে গণ্য হবে। বুখারী ও মুসলিম খুলুন এবং পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকুন। দেখবেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বহু হাদীস রয়েছে এরূপ যা আ‘মাশ কর্তৃক ‘আন দ্বারা বর্ণিত। এই পর্যন্ত লেখার পর ইচ্ছা হল একটু খুঁজে দেখতে। তো কম্পিউটার আমাদেরকে জানান দিল যে, আ‘মাশ কর্তৃক ‘আন দ্বারা বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বুখারী ও মুসলিমে মোট পাঁচশত পঁচিশটি। তন্মধ্যে বুখারীতে একশত আটাশিটি এবং মুসলিমে তিনশত সাঁইত্রিশটি। ঠিক আমাদের আলোচ্য সনদেই তথা ‘আম্র ইব্ন মুর্রাহ থেকে ‘আন দ্বারা বর্ণিত আ‘মাশের হাদীসের সংখ্যা আটটি। সহীহ বুখারীতে দুইটি এবং সহীহ মুসলিমে ছয়টি। আপত্তিকারীকে বলছি, আ‘মাশ কর্তৃক ‘আন দ্বারা বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ৫২৫ টি হাদীসকে আপনি কী বলবেন? যঈফ বলবেন? বলুন। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আপনারা তো আপনাদের মতামত প্রমাণ করতে সহীহ হাদীসকেও জাল বলতে দ্বিধা করেন না। আবার জাল ও যঈফ হাদীসকেও সহীহ বলতে দ্বিধা করেন না।

মুহতারাম, একমুখী অধ্যয়ন ও আংশিক অধ্যয়ন দ্বারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উল্টো তা দ্বারা ব্যক্তি নিজে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় এবং অন্যকেও বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে।

আল জারহু ওয়াত তা‘দীলের কিতাবাদিতে আ‘মাশকে মুদাল্লিস বলা হয়েছে। এবং এটাকেই মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ তাঁদের মত প্রমাণ করতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, আ‘মাশ যেহেতু মুদাল্লিস এবং তিনি ‘আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন, কাজেই হাদীসটি যঈফ। তাঁরা এ দেশের আলেমসমাজকে সম্পূর্ণ মূর্খ মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, আলেমগণ এটা জানতে চেষ্টা করবে না যে, আ‘মাশ মুদাল্লিস হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ. তাঁর মু‘আন‘আন হাদীসকে কেন গ্রহণ করেছেন।

মুদাল্লিস রাবীর স্তরভেদ ও ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আ ‘মাশের মু ‘আন‘আন হাদীস গ্রহণের কারণ

দেখুন , হাফেয ইব্ন হাজার আসকালানী রাহ . কর্তৃক প্রণীত একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন। এই গ্রন্থে তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদেরকে পাঁচ স্তরে বিভক্ত করেছেন। আ‘মাশকে তিনি দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিসগণের অন্তর্ভুক্ত বলে ব্যক্ত করেছেন। আর গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিসগণের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন :

الثَّانِيَةُ مَنِ اِحْتَمَلَ الْأَئِمَّةُ تَدْلِيْسَهُ وَأَخْرَجُوْا لَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيْسِهِ فِىْ جَنْبِ مَا رَوٰى كَالثَّوْرِى أَوْ كَانَ لَايُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَإِبْنِ عُيَيْنَةَ.

অর্থাৎ ‘দ্বিতীয় প্রকার হল , ঐ মুদাল্লিস যাঁর তাদলীসকে মুহাদ্দিসগণ সহনীয় বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁর হাদীসকে তাঁরা সহীহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এর কারণ , ঐ মুদাল্লিস হয়তো এরূপ মুদাল্লিস যিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম পর্যায়ের এবং তাঁর কর্তৃক বর্ণিত প্রচুর হাদীসের তুলনায় তাঁর তাদলীসের সংখ্যা নেহায়েতই স্বল্প। যেমন সুফইয়ান ছাওরী। অথবা তিনি এরূপ মুদাল্লিস যিনি শুধু ছিকাহ রাবী হতেই তাদলীস করে থাকেন। যেমন সুফ্ইয়ান ইব্ন উয়াইনাহ।

আ‘মাশও ঠিক সুফ্ইয়ান ছাওরীর ন্যায়। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম পর্যায়ের এবং তাঁর কর্তৃক বর্ণিত প্রচুর হাদীসের তুলনায় তাঁর তাদলীসের সংখ্যা নেহায়েতই স্বল্প। তাছাড়া তিনি তাঁর যে সকল উস্তায থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের থেকে যখন তিনি ‘আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন তখন তাঁর সেই বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আল্লামা যাহাবী তাঁর আল মীযান গ্রন্থে আ ‘মাশ সম্পর্কে এমনটাই বলেছেন।

আর এই কারণেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ . তাঁদের কিতাবে আ ‘মাশ কর্তৃক বর্ণিত মুআ‘নআ‘ন হাদীস একটি দুটি নয় , বরং পাঁচ শতাধিক মুআ ‘ন‘আন হাদীসকে স্থান দিয়েছেন। এসব হাদীসকে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ কী বলবেন ? যঈফ? বলুন। তাহলে আর বুখারী বুখারী করে চিৎকার করবেন না। কারণ , একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত একশত আটাশিটি হাদীসই যদি যঈফ হয় তাহলে বুখারী আর বুখারী থাকবে না।

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيه، فَرُوِيَ عَنْـهُ عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ زيد وَرُوِىَ عَنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَـلٍ، وَرُوِيَ عَنْـهُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا أَصْـحَابُ مُحَمَّدٍ، قَـالَ ابْنُ خُزَيْمَـةَ: عَبْـدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَـا وَلَا مِنْ بِلَالٍ، فَإِنَّ مُعَاذًا تُوُفِّيَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ سَنَةَ ثَمَان عَشرَةَ، وَبِلَالٌ تُـوُفِّيَ بِدِمَشْـقَ سَـنَة عِشْـرِينَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلى وُلِدَ لِسِتٍّ بَقيْنَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَكَذلِكَ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ. وَمُصْـعَب الزُّبَيْـرِيُّ، فَثَبَتَ انْقِطَاعُ حَدِيثِه.

খেলাফতকাল শেষ হওয়ার ছয় বছর পূর্বে। ওয়াকিদী ও মুস‘আব আয্যুবাইরীও তেমনটাই বলেছেন। সুতরাং আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লার হাদীসটির সুত্রবিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হল।’

ইমাম বায়হাকীর মন্তব্যের সারকথা হল, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা হাদীসটি যার নিকট হতে শুনে বর্ণনা করেছেন বা অন্য ভাষায় বললে, এ ক্ষেত্রে তাঁর উস্তায যিনি তার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি কে? ইমাম বায়হাকী সেই বিভিন্নতার বিবরণ দান করেছেন।

তো এই বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী কর্তৃক, আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা কর্তৃক নয়। তিনি সনদটিকে বিতর্কিত করেননি বা হাদীসের ক্ষেত্রেও তিনি বিতর্কিত হননি। হাদীসের সনদ বিভিন্ন রকম বর্ণিত হয়েছে, আর এই বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী কর্তৃক।

ইমাম বায়হাকীর মন্তব্যের পর্যালোচনা

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সহীহ সনদ প্রমাণ করে যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা হাদীসটি শ্রবণ করেছেন বহু সাহাবী হতে। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্নে খুযায়মাহর বক্তব্যে ইব্নে খুযায়মাহ রাহ. মু‘আয ইবনে জাবাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দের বরাতে বর্ণিত হাদীসকে সুত্রবিচ্ছিন্ন বলেছেন, কিন্তু যে সনদে আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লার উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ’ সেই সনদ সম্পর্কে এখানে তিনি কোন মন্তব্যই করেননি। ইমাম বায়হাকীও সেই সনদ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। একটু পরে ইবনে খুযায়মাহ রাহ.-এর বক্তব্য আমি উদ্ধৃত করব যদ্দারা আমার এই দাবি প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বিষয়টি মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব বা তাঁর পক্ষের আপত্তিকারীও বোধ হয় বুঝেছেন। আর এ কারণেই আপত্তিকারী এরপর লিখেছেন, এক্ষণে অন্যান্য সাহাবীদের থেকে আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লার হাদীসটি

(ক) মুদাল্লিস আ‘মাশের মুআ‘ন‘আন বর্ণনার কারণে যঈফ।

(খ) এছাড়া আবু দাউদ বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রা) এর আযানের ইতিহাস সম্পর্কিত অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী।

''আ'মাশের মুআ'ন'আন বর্ণনার কারণে যঈফ'' কথাটি তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমি বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি যে, তাহলে বুখারী ও মুসলিমের পাঁচশতাধিক হাদীসকে যঈফ বলতে হবে। তাছাড়া হাদীসটি আমর ইব্ন মুররাহ থেকে শুধু আ'মাশ নয়, শু'বাও বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য, মুসান্নাফ, হাদীস ২১৩৭; সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ৫০৬

আর আব্দুর রহমান ইবন্ আবী লায়লার হাদীসটি আবূ দাউদের যে সহীহ হাদীসের বিরোধী বলে আপত্তিকারী দাবি করেছেন সেই হাদীসটি সহীহ নয়, হাসান পর্যায়ের। আপত্তিকারী নিজেই হাদীসটির বিবরণদানের পর শু'আইব আরনাউতকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'হাদীসটি হাসান'। উল্লেখ্য, হাদীসটি আবূ দাউদের ৪৯৯ নং হাদীস। তো হাসান বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় কোনো সহীহ হাদীসের প্রামাণ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না।

ইবনে খুযায়মাহর মন্তব্য নিয়ে আলোচনা

মুহতারাম, ইবনে খুযায়মাহ রাহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লার হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই কথা বলে -

فَأَمَّا مَا رَوَى الْعِرَاقِيُّوْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ جِهْةِ النَّقْلِ وَقَدْ خَلَطُوْا فِيْ أَسَانِيْدِهِمْ.

অর্থাৎ ইরাকীরা আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা বর্ণনাগত দিক দিয়ে প্রমাণিত। তবে তাঁরা তাঁদের সনদে গোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

ইব্ন খুযায়মাহর এই মন্তব্য আমার পূর্বের দাবিকে জোরালো করে যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লার হাদীসটির যে সনদে তিনি এই কথা বলেছেন যে, 'আমার নিকট বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণ' সেই সনদটির সুত্রবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি এখানে বলছেন যে, ইরাকীরা সনদে গোল পাকিয়ে ফেললেও হাদীসটি বর্ণনাগত দিক থেকে প্রমাণিত। সনদে গোল পাকানো সত্ত্বেও হাদীসটি প্রমাণিত হল কেন? তার কারণ এটাই যে, ঐ সনদটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মুত্তাসিল সনদ।

وَهَذَا إِسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ مِنْ إِسْنَادِ الْكُوفِيِّينَ فَصَحَّ أَنَّ تَثْنِيَةَ الْإِقَامَةِ قَدْ نُسِخَتْ؛ وَأَنَّهُ هُوَ كَـانَ أَوَّلَ الْأَمْـرِ؛ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَخَذَ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ وَأَدْرَكَ بِلَالًا وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ فَلَاحَ بُطْلَانُ قَوْلِهِمْ بِيَقِينٍ.

ইব্ন হায্ম (রাহিমাহুল্লাহ)-র বক্তব্য নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার পূর্বে প্রসঙ্গত বলছি যে, এই সকল ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরা না আরবী বোঝে, না সহীহ শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে জানে। আন্ডার লাইন করা অংশের মধ্য হতে বোল্ড করা অংশটুকু দেখুন। বাংলা ব্যাকরণের কোন নিয়ম অনুযায়ী বাক্যটি গঠিত হয়েছে? আর আরবী না বোঝার ব্যাপারটি তো আরও শোচনীয়।

তরজমাটি হওয়া উচিত এইরূপ: ‘আর এটা কূফীদের সনদের মধ্য হতে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহীহ সনদ। সুতরাং সহীহভাবে প্রমাণিত হল যে, দুইবার করে ইকামত বলাটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং তা ছিল প্রথম দিকে। আর আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা একশত বিশজন সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং হযরত উমার ও বেলালকে পেয়েছেন। অতএব তাদের মতটি বাতিল হওয়াটা নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

ইব্ন হাযম রাহ.-এর মন্তব্য ও পর্যালোচনা

মুহতারাম, আযানের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচ্য হাদীসটি (যে হাদীসকে আ‘মাশের মু‘আন‘আন বর্ণনার কারণে আপত্তিকারী যঈফ বলেছেন) আল্লামা ইব্ন হাযমের মতে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহীহ। আপত্তিকারী মাওলানা আব্দুল মতিন ছাহেবের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, তিনি ইব্ন হাযমের আংশিক মন্তব্য ঊল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এই পুরো বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে তার তরজমা করেছেন এবং ভুল তরজমা করেছেন।

মুহতারাম, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের যে সনদে আছে যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা বলেন, ‘আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ’ সেই সনদে হাদীসটি যে অত্যন্ত সহীহ তা প্রমাণ করতেই ইব্ন হাযম রাহ. বলেছেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী

লায়লা একশত বিশজন সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন। এবং হযরত উমর রাযি. এবং হযরত বেলাল রাযি.-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। সুতরাং তিনি যে বলেছেন, ‘আমাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন’

তাঁর এই কথাটি যথার্থ। কাজেই হাদীসটি সুত্রবিচ্ছিন্ন নয়, হাদীসটি সুপ্রমাণিত। আর এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার বিষয়টি পূর্বকালের বিষয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলতে হযরত বেলালকে নির্দেশ দেন । ইব্ন হাযম রাহ . বলছেন, সুতরাং প্রমাণিত হল যে , ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলাটা মানসূখ হয়ে গেছে। আর এর দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের কথা নিশ্চিতভাবে বাতিল প্রমাণিত হল যারা বলে যে , ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে। এই ছিল ইব্ন হাযম রাহ .-এর বক্তব্যের সারমর্ম । এগুলো তাঁর উক্তি হিসেবে নিশ্চিত বাতিল কথাটি মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ কোত্থেকে বুঝলেন তা আল্লাহই ভাল জানেন । قَوْلِهِم -এর মধ্যকার সর্বনামটি যে বহুবচন , একবচন নয় তা কি তাঁরা জানেন না ? জানলে তো একটু চিন্তা করতেন আর কথাটির মর্ম কী তা -ও তাঁরা বুঝতে পারতেন । জনাব আব্দুল মতিন ছাহেব ইব্ন হাযম রাহ .-এর পুরো বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেননি। কারণ , মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা যে এত স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী তা তিনি বুঝতে পারেননি। ইব্ন হাযম রাহ . কী বুঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে আরও একটু আগে থেকে তাঁর বক্তব্য যদি আপত্তিকারী পাঠ করে নিতেন তাহলেও হয়তো এত বড় ভুলটা তিনি করতেন না।

যা হোক, পুরো বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে আপত্তিকারী বরং উপকারই করেছেন। কারণ , ইব্ন হাযম রাহ .-এর দাবি হল , ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলাটা মানসূখ হয়ে গেছে। কারণ, সেটা ছিল প্রথম দিকে। এর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে , আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রাযি .-এর দেখা স্বপ্নে ইকামতের বাক্যগুলো ছিল দুইবার করে। যদি আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রাযি .-এর স্বপ্নে দেখা ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে হত তাহলে ইব্ন হাযম রাহ . ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে হওয়ার বিষয়টিকে মানসূখ বলতে পারতেন না। তখন বিষয়টি উল্টে যেত এবং একবার করে বলাটাই মানসূখ হিসেবে নিশ্চিত হয়ে যেত। তো আমার আলোচনা চলছিল এই বিষয় নিয়েই যে , আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রাযি .-এর দেখা স্বপ্নে ইকামতের বাক্য কীরূপ ছিল। উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে , তাঁর দেখা স্বপ্নে ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে ছিল। বাকি রইল এটি মানসূখ হয়েছে কি না সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আপনি বলতে পারেন যে , সুনানে আবূ দাউদের ৪৯৯ নং হাদীস দ্বারা তো বুঝা যায় যে , আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিক্ষহীর স্বপ্নে দেখা ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে ছিল। এর জবাবে বলব যে , হাঁ তা বুঝা যায়। কিন্তু হাদীসটি হাসান , সহীহ নয়। আপত্তিকারীরাও এটা জানে। যেমনটা একটু পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

[illegible], [illegible] :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى.

[illegible] :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible],

صَدُوْقٌ وَلكِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ([illegible], [illegible]) [illegible],

لَيسَ بِذَاكَ هُوَ ضَعِيُفٌ ([illegible], [illegible]) [illegible], يُكْتَبُ حَدِيُثُهُ ([illegible]) [illegible], ‘[illegible]’ [illegible], [illegible]. [illegible] :

اَمَّا فِي الْمَغَازِيْ وَأَشْبَاهِه فَيُكْتَبُ وَاَمَّا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَيُحْتَاجُ إِلَى مَثْلِ هذَا، وَمَدَّ يَدَهُ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible], [illegible])

তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা তো গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু হালাল হারামের ক্ষেত্রে তথা বিধি বিধানের ক্ষেত্রে আরও মজবুত রাবীর প্রয়োজন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক সেইরূপ মজবুত রাবী নন।

আর এইসব কারণেই ইমাম বুখারী রাহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত কোনো হাদীস সন্নিবেশিত করেননি। আর ইমাম মুসলিম রাহ.-ও স্বীয় গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক কর্তৃক একাকী বর্ণিত কোনো হাদীস আনেননি। হাঁ, অন্য কোনো রাবীর অনুগামী হিসেবে এনেছেন। অর্থাৎ যদি কোনো হাদীস অন্য কোনো বর্ণনাকারী কর্তৃকও বর্ণিত হয়ে থাকে এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক কর্তৃকও বর্ণিত হয়ে থাকে তখন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের নাম বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য বর্ণনাকারীর নামও উল্লেখ করে দিয়েছেন। যে হাদীস শুধু ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত সেই হাদীস তিনি তাঁর কিতাবে আনেননি।

পক্ষান্তরে আ‘মাশ কর্তৃক বর্ণিত আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লার হাদীসটির সনদ দেখুন। এই সনদের প্রত্যেক রাবী বা বর্ণনাকারী হাফেযে হাদীস এবং অত্যন্ত উচ্চমানের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাদের সকলেই বুখারী ও মুসলিমের রাবী। অন্যান্য কিতাবের তো বটেই। আর এ কারণেই ইব্ন হাযম রাহ. এই হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং বলেছেন, জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দেওয়ার বিষয়টি প্রথম দিকে ছিল। অর্থাৎ প্রথম দিকে যে ইকামত ছিল তা ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে, একটি একটি বাক্যে নয়।

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদি রাবিক্ষহী তো আযান ও ইকামত সংক্রান্ত স্বপ্ন একবারই দেখেছিলেন, দুইবার নয়। যদি দুইবার দেখে থাকতেন তাহলে আবূ দাউদের ৫০৬ নং ও ৪৯৯ নং হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা যেত। আমরা তখন বলতে পারতাম যে, এক স্বপ্নে তিনি ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে দেখেছিলেন আর আরেকবারের স্বপ্নে দুইবার করে দেখেছিলেন। স্বপ্ন যখন একবারই দেখেছিলেন তখন এটা নিশ্চিত যে, তাঁর স্বপ্নে দেখা ইকামতের বাক্যগুলো হয় একবার করে ছিল নতুবা দুইবার করে ছিল। একবার করেও ছিল, দুইবার করেও ছিল তা কোনোভাবেই হতে পারে না। অতএব কোনো একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা কর্তৃক বর্ণিত জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত আবূ দাউদের ৫০৬ নং হাদীসটি সহীহ এবং তা বেজোড় বাক্যে ইকামত দান সংক্রান্ত আবূ দাউদের ৪৯৯ নং হাসান হাদীসের উপর প্রাধান্য

পায়। ইব্‌ন হাযম রাহ . এবং ইব্‌ন খুযায়মাহ রাহ . জোড়া বাক্যে আযান ও ইকামত স্বপ্নে দেখার বিষয়টিকে সুপ্রমাণিত বলেছেন। যেমনটা একটু পূর্বে আলোচনা করে আসলাম।

মুহতারাম , উপরিউক্ত হাদীসটি ছিল স্বপ্নে আযান ও ইকামত দেখা সংক্রান্ত হাদীস। ঐ হাদীসেই এই কথা বর্ণিত হয়েছে যে , আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ ইবনে আবদি রাবিহ্ষহী রাযি . স্বপ্নে যেভাবে আযান ও ইকামত দেখেছিলেন হযরত বেলাল রাযি . ঠিক সেভাবেই আযান ও ইকামত দিয়েছিলেন। আর সেই আযান ও ইকামত ছিল একই প্রকারের। তথা জোড়া জোড়া শব্দে।

উপরিউক্ত হাদীসটি ছাড়াও আরও কিছু হাদীস আমাদেরকে জানান দেয় যে , হযরত বেলাল রাযি . ইকামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া বলতেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দলীল- ২

হযরত বেলাল রাযি . জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিতেন

জোড়া বাক্যে ইকামত : হাদীস -২

বিখ্যাত তাবিঈ হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ রাহ . বলেন :

أَنَّ بِلَالاً كَانَ يُثَنِّي الْاَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ

অর্থাৎ বেলাল রা . আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে বলতেন এবং ইকামতের বাক্যগুলোও দুইবার করে বলতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক , হাদীস নং ১৭৯০ ; দারা কুতনী , হাদীস নং ৯৪০) দারা কুতনী মূলত আব্দুর রাযযাকের সূত্রে হাদীসটি তাঁর সুনান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। আর আব্দুর রাযযাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মা ‘মারের সুত্রে । বলেছেন :

اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ.

আব্দুর রাযযাক আরেকটি সনদে আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন যে , বিলাল রা .-এর আযান ও ইকামত ছিল দুইবার দুইবার করে। সনদ ও হাদীসের বাক্যটি এইরূপ :

عَنِ الثَّوْرِي عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ قَالَ كَانَ أَذَانُهُ وَ إِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

আপত্তিকারী লিখেছেন, আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ তাবেঈ ছিলেন। তিনি নবী (স) এর যামানা পাননি। আমি বলছি, হাঁ আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ তাবেঈ ছিলেন। সাহাবী ছিলেন না। কিন্তু ‘তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা পাননি’- এই কথাটি ঠিক নয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মুসলমান হয়েছেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি। এজন্যই তাঁকে বলা হয় মুখাদরাম। মুখাদরাম বলা হয় ঐ সকল ব্যক্তিকে যাঁরা রাসূলের যামানায় মুসলমান হয়েছেন, কিন্তু রাসূলের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি।

এরপর আপত্তিকারী লিখেছেন, অর্থাৎ আসওয়াদের পক্ষে বিলালের আযান শোনার সুযোগ ঘটেনি। অথচ বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি আযান শুনেছেন।

আমি বলছি, না বর্ণনা থেকে তা মনে হয় না। বর্ণনার কোথাও এরকম কোনো ইঙ্গিত আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ দেননি। তিনি শুধু একটি ঘটনার বিবরণ দান করেছেন যে, বিলাল রা. আযান ও ইকামতের কালিমাগুলো দুবার দুবার করে বলতেন। এটি একটি সংবাদ। কোনো সংবাদদাতা কর্তৃক একটি সংবাদদান এটা প্রমাণ করে না যে, সংবাদদাতা ঐ সংবাদ নিজে দেখে বা শুনে সংবাদ দিচ্ছেন বলে দাবি করছেন। সংবাদদাতা ঘটনা নিজে দেখে বা শুনেও সংবাদ দিতে পারেন, আবার অন্য কোনো সূত্রে জেনে বা শুনেও সংবাদ দিতে পারেন। সংবাদদাতা কীভাবে ঘটনাটি জানলেন বা শুনলেন তা বুঝা যাবে পারিপার্শ্বিক লক্ষণাবলী দ্বারা। আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ বিলাল রা. কর্তৃক আযান ও ইকামতের কালিমাগুলো দুবার দুবার করে বলার বিষয়টি কার কাছ থেকে শুনলেন বা জানলেন সে আলোচনায় পরে আসছি।

এরপর আপত্তিকারী লিখেছেন, তাছাড়া সহীহ মুসলিমে সহীহ সনদে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বিতর্কিত এই হাদীসটি সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। আমি বলছি, এই একই গান তিনি সবজায়গাতেই গেয়ে গেছেন। জোড়া বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত সব হাদীসের ক্ষেত্রেই তিনি এই গান গেয়েছেন। কাজেই এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরেই ব্যক্ত করতে চাই।

(খ) চিহ্নযুক্ত দফায় আপত্তিকারী ইবরাহীম নাখাঈকে মুদাল্লিস বলেছেন। আপত্তিকারীর দাবি হল, ইবরাহীম নাখাঈ যেহেতু মুদাল্লিস এবং তিনি ‘আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন সেহেতু তাঁর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি যঈফ।

ইবরাহীম নাখাঈ মুদাল্লিস এবং তাঁর মুআনআন হাদীস যঈফ?

মুহতারাম, এবার বুঝুন এরা নিজেদের মত প্রমাণ করতে কী রকম জালিয়াতির আশ্রয় নেয়? অথবা বুঝুন এদের জ্ঞানের দৌড় কতটুকুন? কারণ, প্রথমত তাহকীক ও গবেষণা-নির্ভর কথা হল, ইবরাহীম নাখাঈর ব্যাপারে মুদাল্লিস হওয়ার দাবি সন্দেহযুক্ত। দেখুন, ‘মু‘জামুল মুদাল্লিসীন’ মুহাম্মাদ বিন তাল‘আত, পৃষ্ঠা ৭৬। দ্বিতীয়ত এই দাবি ঠিক ধরে নেওয়া হলেও তিনি দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস। আর দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস হলেন তাঁরা যাঁদের তাদলীসকে মুহাদ্দিসগণ সহনীয় বলে জ্ঞান করেছেন এবং যাঁদের হাদীসকে তাঁরা তাঁদের কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। এ সম্পর্কে পূর্বে আমি আ‘মাশের উপর একই জাতীয় আপত্তির জবাবে ‘মুদাল্লিস রাবীর স্তরভেদ’ শিরোনামে আলোচনা করে এসেছি। ইবরাহীম নাখাঈর মু‘আন‘আন হাদীস যদি যঈফ হয় তাহলে বুখারী ও মুসলিমের বহু হাদীসকে যঈফ বলতে হবে। আর তখন বুখারী ও মুসলিমকে আল জামে‘ আস্সহীহ বিশেষণে বিশেষায়িত করতে পারবেন না। কারণ, আ‘মাশ, ইবরাহীম নাখাঈসহ বেশ কিছু মুদাল্লিস রাবীর মু‘আন‘আন বর্ণনা তাঁরা তাঁদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন। শুধু আ‘মাশের মু‘আন‘আন বর্ণনাই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে পাঁচ শতাধিক।

আর ইবরাহীমের মু‘আন‘আন বহু বর্ণনা বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। নমুনা স্বরূপ দেখুন ৩২, ১২৫, ৪০৯ নং হাদীস। আলোচ্য সনদের এই যে আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, তাঁর থেকেই ইবরাহীম নাখাঈর মু‘আন‘আন বর্ণনা বুখারী শরীফে বহু দেখতে পাবেন। উদাহরণত দেখুন ২৭১, ২৯৯, ৫০৮ ৬৭৬ নং হাদীস। এই নাম্বারগুলো দেওয়া হল নমুনা স্বরূপ। আরও বহু হাদীস আপনি দেখতে পাবেন যেগুলো ইবরাহীম নাখাঈর মু‘আন‘আন বর্ণনা, এবং যেগুলোকে ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা আন্তর্জাতিক কোনো চক্রের খপ্পরে পড়েছেন কি না জানি না। নতুবা এরকম মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য কোনো আলেমেদ্বীন পরিবেশন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সম্পর্কে আপত্তিকারীর আপত্তি নিয়ে আলোচনা

এরপর আপত্তিকারী (গ) চিহ্নযুক্ত দফায় আলোচ্য হাদীসটির সনদের একজন রাবী হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান সম্পর্কে দুটি কথা বলেছেন, এক: তিনি মুতাকাল্লাম ফীহ (বিতর্কীত) রাবী। দুই: তিনি ইখতিলাতকারী (বর্ণনাতে হেরফেরকারী)। দ্বিতীয় কথাটির পক্ষে তিনি আল্লামা হায়সামীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

আমার বক্তব্য হল, ‘মুতাকাল্লাম ফীহ’ বলে আপত্তিকারী কী বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করেননি। আপত্তিকারীর মনে রাখা উচিত যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বহু রাবী আছেন, যাঁরা মুতাকাল্লাম ফীহ। মুতাকাল্লাম ফীহ হলেই রাবী যঈফ হয়ে যায় না। আর আপত্তিকারী দ্বিতীয় বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যে, তিনি ইখতিলাতকারী (বর্ণনায় হেরফেরকারী)।

প্রথম কথা হল, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রাহ.-এর বিষয়ে ইখতেলাত -এর দাবিটাই ভুল। বিস্তারিত সামনে বলছি।

দ্বিতীয়ত, আপত্তিকারী ইখতিলাতের যে অর্থ করেছেন তা একেবারেই ভুল। বাংলা ভাষায় ‘হেরফের করা’ দ্বারা কোনো কিছুতে ইচ্ছাকৃত রদবদল করাকে বুঝায়। অথচ হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমানের ব্যাপারে সবাই একমত যে তিনি صَدُوْقُ اللِّسَانِ (সত্যভাষী) ছিলেন।

সাধারণ পরিভাষা হিসেবে ইখতেলাত হল বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার ফলে তার বর্ণনাগুলোর ইয়াদ বা স্মরণ দুর্বল হয়ে যাওয়াতে ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণনার ক্ষেত্রে মুশাব্বাহ লেগে যাওয়া বা বিভ্রম সৃষ্টি হওয়া। আর সে কারণে বিভিন্ন ভুল সৃষ্টি হওয়া। এ ভুল সামান্য পরিমানে হলে বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলা যায় না। বেশি পরিমানে হলে বা মারাত্মক ধরনের একাধিক ভুল হয়ে থাকলে তখন বর্ণনাকারীর সে সকল ছাত্রের বর্ণনা গ্রহণ করা হয় যারা বর্ণনাকারীর এ নতুন অবস্থা সৃষ্টির পূর্বে তার কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

বুঝা গেল, বর্ণনাকে হেরফের করার নাম ইখতেলাত নয়। বরং ইখতিলাত হল, বর্ণনাতে মুশাব্বাহ লেগে যাওয়ার কারণে তাতে কোনো ভুল হয়ে যাওয়া।

এতো হল ইখতিলাতের ব্যাখ্যা কিন্তু হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান এর ব্যাপারে ইবনে সাদ এমন মত ব্যক্ত করে থাকলেও তা দলীলনির্ভর নয়। হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান রাহ. বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই ইন্তেকাল করে যান। শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. লিখেছেন,

مات كهلا رحمه الله

আরো লিখেছেন,

وليس هو بالمكثر من الرواية لأنه مات قبل أوان الرواية.

لِمَ تَرْوِيْ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ وَكَان مُرْجِئًا؟

كَانَ صَدُوْق اللِّسَانِ [1]

كَـانَ أَحْفَـظَ مِنَ الْحَكَمِ

كَانَ لَايَحْفَـظُ

[illegible] كَانَ لَا يَحْفَظُ [illegible]

[illegible] حَمَّاد بْنُ أَبِيْ سُـلَيْمَان يُقَـدَّمُ عَلَى أَبِي مَعْشَـرٍ [illegible]

[illegible] كُوْفِيٌ ثِقَةٌ كَانَ أَفْقَـهَ أَصْـحَابِ إِبْـرَاهِيْمَ [illegible]

[illegible] إِنَّمَا التَّخْلِيْطُ فِيْهَا مِنْ سُوْءِ حِفْظِ الرَّاوِيْ عَنْهُ [illegible]

আবু হানীফাও নাই ? যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বেশী তার সোহবতে ছিলেন । রাবীদের

চরিতাভিধান তালাশ করে তো আমরা তাঁর আরও কুদামা শাগরিদের সন্ধান পাই । ইমাম আবূ হানীফা , মিস্ ‘আর ইব্ন কিদাম , সুলাইমান ইব্ন মিহরান আল আ ‘মাশ, হাকাম ইব্ন ‘উতাইবাহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ রাবীগণ সকলেই হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কুদামা

শাগরিদ । এমনকি আলোচ্য হাদীসের রাবী মা ‘মারও তাঁর কুদামা শাগরিদদের একজন । দেখুন , তাঁদের প্রদত্ত তালিকার তিনজনের মধ্য হতে শু ‘বা মৃত্যুবরণ করেছেন ১৬০ হিজরীতে। তিনি সপ্তম তাবাকার রাবী। সুফইয়ান ছাওরী মৃত্যুবরণ করেছেন ১৬১ হিজরীতে। তাঁর জন্ম ৯৭ হিজরীতে। তিনিও সপ্তম তাবাকার রাবী। অথচ ইমাম আবূ হানীফা জন্মগ্রহণ করেছেন ৮০ হিজরীতে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৫০ হিজরীতে। তিনি ষষ্ঠ তাবাকার রাবী। তো তিনি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কুদামা শাগরিদদের তালিকাভুক্ত হলেন না কেন? তদ্রূপ মিস্ ‘আর ইব্ন কিদাম মৃত্যুবরণ করেন ১৫৩ হিজরীতে , মতান্তরে ১৫৫

হিজরীতে। তো তিনি সুফইয়ান ছাওরী অপেক্ষা ছয় বছর বা আট বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন । তিনিও সপ্তম তাবাকার রাবী। তিনি কেন হাম্মাদের কুদামা শাগরিদদের তালিকাভুক্ত হলেন না ? আরও আশ্চর্যের বিষয় হল , সুলাইমান ইব্ন মিহরান আল আ ‘মাশও হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন , আর তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৬১ হিজরীর শুরুর দিকে এবং ইন্তিকাল করেছেন আটাশি বছর বয়সে ১৪৮ হিজরীতে। তিনি পঞ্চম তাবাকার রাবী। তো হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কুদামা শাগরিদদের তালিকায় তাঁর নাম কেন ঠাঁই পেল না ? তারপর দেখুন , হাকাম ইব্ন ‘উতাইবাহ ষাট বছরের কিছু অধিক বয়স পেয়ে ১১৫

বা ১১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন । তিনিও ছিলেন পঞ্চম তাবাকার রাবী। আল্লামা যাহাবী আলকাশেফ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন , فَقِيْهُ الْكُوْفَـةِ مَـعَ حَمَّادٍ (হাম্মাদের সঙ্গে কূফার ফকীহ ছিলেন) তিনিও হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান থেকে রেওয়ায়েত

করেছেন। তো তিনি কেন হাম্মাদের কুদামা শাগরিদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন না ? আর আলোচ্য হাদীসের রাবী মা ‘মার ৯৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন

১৫৪ হিজরীতে। তিনি ছিলেন সপ্তম তাবাকার রাবীদের মধ্যে অগ্রজ রাবীদের একজন । সুফইয়ান আর শু ‘বা যদি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কুদামা শাগরিদ হয়ে থাকেন তাহলে মা ‘মার কেন কুদামা শাগরিদদের একজন হবেন না ? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে হয় বলতে হবে যে , তিনি ইখতিলাতের শিকার আদৌ হননি , অথবা বলতে হবে যে , তিনি ইখতিলাতের শিকার হয়ে থাকলেও তাঁর কুদামা শাগরিদগণের তালিকা তিনজনের মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয় । বরং তাঁর কুদামা শাগরিদগণের তালিকা আরও দীর্ঘ । যাঁদের মধ্যে আলোচ্য হাদীসের রাবী মা 'মারও একজন।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের ইখতিলাত সম্পর্কে শেষ কথা

এই দীর্ঘ আলোচনার পর বলতে চাই যে , হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান ছিকাহ রাবী। তাঁর ইখতিলাত দোষের শিকার হওয়ার দাবিটি যুক্তির নিরিখে টেকে না। দেখুন , যাঁরা ইখতিলাত-দোষ সম্পন্ন রাবীদের তালিকা তৈরি করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা তাঁদের ঐসব গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। যেমন , বুরহানুদ্দীন আল হালাবী আবুল ওয়াফা ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ বিন খলীল (মৃত্যু ৮৪১ হিজরী) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন أَلْإِغْتِبَاطُ بِمَنْ رُمِيَ مِنَ الـرُّوَاةِ بِالْإِخْتِلَاطِ নামে। এই গ্রন্থে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নাম নাই । তদ্রূপ , আল্লামা 'আলাঈ মুখতালিত রাবীদের তালিকা তৈরী করে اَلْمُخْتَلِطِيْنَ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন । তিনিও তাঁর এই গ্রন্থে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আল্লামা হায়সামী অপেক্ষা প্রবীণ ও পূর্বকালের । আল্লামা হায়সামী মৃত্যুবরণ করেন ৮০৭ হিজরীতে। আর আল্লামা 'আলাঈ মুত্যুবরণ করেন ৭৬১ হিজরীতে। তারপর দেখুন , আল্লামা যাহাবী হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সম্পর্কে 'আলকাশিফ'-এ বলেছেন , ثِقَـةٌ إِمَـامٌ مُجْتَهِـدٌ كَـرِيْمٌ جَـوَادٌ (ছিকাহ , ইমাম , মুজতাহিদ , সম্ভ্রান্ত , দানশীল)। হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমানের ইখতিলাত দোষের কোনো উল্লেখই এখানে আল্লামা যাহাবি করেননি। বুঝা যায় , যাঁরা তাঁর সম্পর্কে এই দাবী করেছেন তাঁদের দাবিটি আল্লামা যাহাবীর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীও তাঁর সম্পর্কে ইখতিলাতের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন , صَدُوْقٌ لَهُ اَوْهَامٌ অর্থাৎ 'হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সত্যভাষী , (রেওয়ায়েতে) তাঁর কিছু ওয়াহ্ম আছে। ' ওয়াহ্ম আর ইখতিলাত এক কথা নয় । ওয়াহ্ম তো হাফেজ রাবীদের থেকেও সংঘটিত হতে পারে। কোনো রাবী হাফেজ ও তুখোড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় তাঁর থেকে ভুল হতে পারে। হয়ে যায় । আর ইখতিলাত হল রাবীর স্মৃতিবিভ্রাট দোষ । সুতরাং দুটো এক বিষয় নয় ।

[illegible].-[illegible]

[illegible]. [illegible], صَدُوْقٌ لَهُ اَوْهَامٌ [illegible] '[illegible], ([illegible]) [illegible]' [illegible] '[illegible] :

بَلْ صَدُوْقٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ وَ إِنَّمَا نَزَلَ اِلَى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ بِسَبَبِ اَوْهَامٍ كَانَتْ تَقَعُ لَهُ، وَثَّقَهُ يَحْيى بْنُ مَعِيْنٍ وَالنَّسَائِي وَالْعِجْلِي، وَفَضَّلَهُ يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَلى مُغِيْرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ -وَهُوَ ثِقَةٌ -، لكِنَّهُ كَانَ مُنْصَرِفًا إِلى الْفِقْهِ مَعْنِيًّا بِهِ لَيْسَ كَعِنَايَتِه بِحِفْظِ الْآثَارِ، لِذَالِكَ قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ : هُوَ صَدُوْقٌ لَايُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ، وَهُوَ مُسْتَقِيْمٌ فِي الْفِقْهِ، فَإِذا جَاءَ الْآثَارُ شَوَّشَ. وَضَعَّفَهُ اِبْنُ سَعْدٍ، وَ لَعَلَّ بَعْض مَنْ ضَعَّفَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ كَوْنِه مِنْ اَهْلِ الرَّأْيِ، وَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِرْجَاءِ، وَهُوَ تَضْعِيُفٌ ضَعِيْفٌ، وَقَالَ الذَّهَبِي : ثِقَةٌ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ.

[illegible] : [illegible], [illegible] ([illegible])[illegible] '[illegible] -[illegible]- [illegible] ([illegible]) [illegible], '[illegible], [illegible][2] [illegible] ([illegible]) [illegible]' [illegible]'[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible], [illegible]- : [illegible] : [illegible])

[illegible], [illegible]'[illegible]'[illegible] '[illegible]' [illegible], [illegible] صَدُوْقٌ لَهُ اَوْهَامٌ -[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]- [illegible]

[illegible], [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible]-[illegible]

[illegible], [illegible]

তাঁরা বলতে চাইছেন যে , তিনি ছিকাহ রাবী হওয়ার কারণে তাঁর হাদীস সহীহ হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু কিছু ওয়াহ্মের কারণে তিনি একটু নিচের পর্যায়ে নেমে এসেছেন । কিন্তু তাঁর ওয়াহ্ম এই পর্যায়ের নয় , যে পর্যায়ের হলে তাঁকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করা যায় । এরপর তাঁরা ফিকহের প্রতি হাম্মাদের অধিক মনোনিবিষ্টতার কথা তুলে ধরেছেন এবং যাঁরা তাঁকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে , যাঁরা তাঁকে যঈফ বলে মত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা মূলত ফিকহের প্রতি হাম্মাদের অধিক মনোনিবিষ্টতা ও তাঁর আহলুর রায় হওয়ার কারণে তাঁকে যঈফ বলে মত ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু এই কারণে কোনো রাবীকে যঈফ বলে অভিমত ব্যক্ত করা দুর্বল অভিমত ।

হাম্মাদ সম্পর্কে এটাই শেষ ও চূড়ান্ত কথা। তিনি শেষ বয়সে ইখতিলাতের শিকার হয়েছিলেন এই দাবি সঠিক নয়। সঠিক হলে মুখতালিত রাবীদের সম্পর্কে লিখিত চরিতাভিধানে তাঁর নাম অবশ্যই থাকত। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা যাহাবী কর্তৃক তাঁর সম্পর্কে ইখতিলাত দোষের উল্লেখ না করণ প্রমাণ করে যে , যাঁরা তাঁর সম্পর্কে ইখতিলাতের দাবি করেছেন তাঁদের দাবিটি তাঁদের উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর শেষ বয়সে তাঁর ইখতিলাত হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেই তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে , তাঁর কুদামা শাগরিদদের তালিকা তো বেশ দীর্ঘ। তাহলে কেন শুধু তিনজনের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হবে ? অন্যান্যরা কেন তাঁর কুদামা শাগরিদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না ? এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। আলোচ্য হাদীসের রাবী মা ‘মারও তাঁর কুদামা শাগরিদদের একজন। তাঁর রেওয়ায়েত কেন গ্রহণযোগ্য হবে না ? মোটকথা হাম্মাদ ছিকাহ রাবী এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাঁ , ছিকাহ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশত তাঁর হাদীসকে সহীহ বলা যাচ্ছে না সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তাঁর হাদীস হাসান পর্যায়ের অবশ্যই।

দেখুন , মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের চিন্তাগুরু ও তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের সর্বাপেক্ষা অধিক ভরসাস্থল নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ .-ও হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে যঈফ বা ত্রুটিপূর্ণ বলতে সাহস পাননি। হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান বর্ণিত حُسْنُ الصَّوْتِ زِيْنَةُ الْقُـرْآنِ হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী রাহ . হাসান বলেছেন। বলেছেন-

وَهذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، مَدَارُ طُرُقِه عَلى حَمَّاد بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ صَدُوْقٌ لَهُ اَوْهَامٌ.

এটা হাসান সনদ, এই হাদীসের সকল সনদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হলেন, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান। তিনি সত্যভাষী। তাঁর রেওয়ায়েতে অনেক ওয়াহ্ম আছে। (দ্রষ্টব্য: সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, খ- ৪, ভুক্তি নং ১৮১৫।)

বুঝা গেল, তিনি তাঁর ওয়াহমকে ঐ পর্যায়ের গণ্য করেননি যে পর্যায়ের ওয়াহমের কারণে রাবীকে যঈফ বলা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান থেকে বর্ণনাকারী শু‘বা, সুফইয়ান ছাওরী বা হিশাম আদ দাসতাওয়াঈ- এই তিনজনের কেউ নয়। হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ উবাইদাহ সাঈদ ইবনে যারবী এবং আবূ মুয়াবিয়া আল ‘আবাদানী। বুঝা গেল যে, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান থেকে শু‘বা, সুফইয়ান ছাওরী এবং হিশাম আদ দাসতাওয়াঈ ব্যতীত অন্য কারও বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়-আল্লামা হাইসামীর এই দাবি আলবানী সাহেবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ছাড়া হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান বর্ণিত তবারানীর আল-মু‘জামুল আওসাতের ৫১১৬ নং হাদীসকেও আলবানী সাহেব হাসান বলেছেন। (দ্রষ্টব্য: সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, খ- ৫, ভুক্তি নং ২৪২৬।) আরও মজার ব্যাপার হল, এই দুটো হাদীসই হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম নাখাঈ থেকে। যাঁকে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা মুদাল্লিস বলে আখ্যায়িত করে তাঁর হাদীসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কোনো কোনো হাদীসকে তো মরহুম আলবানী সাহেব হাসান নয়, সহীহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণত হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান কর্তৃক বর্ণিত সুনানে আবূ দাউদের ৩৭২ নং হাদীসকে তিনি সহীহ বলেছেন। সেই হাদীসটির বর্ণনাকারীও শু‘বা, সুফইয়ান ছাওরী ও হিশাম এই তিনজনের কেউ নয় বরং হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ। সুনান আন নাসাঈর ৫৬৫৪ নং হাদীসকেও তিনি সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটিতেও হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান আছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সম্পর্কে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিরক্তিকর হওয়া সত্ত্বেও আলোচনা দীর্ঘ করতে হল শুধু মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের অজ্ঞতা ও হঠকারী চরিত্রের নমুনা তুলে ধরতে।

হাদীসটির সুত্র-বিচ্ছিন্নতার দাবি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

[illegible]

أَمَّا مَا رَوَاهُ اَبُوْ دَاود مِنْ أَنَّ بِلَالًا ذَهَبَ إِلى الشَّامِ فِيْ حَيَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ بِهَـا حَتّى مَـاتَ فَهُـوَ مُرْسَـلٌ وَفِيْ إِسْنَادِه عَطَاءٌ اَلْخُرَاسَانِى وَهُوَ مَدَلِّسٌ.

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible], [illegible]’

‘[illegible]. [illegible]। [illegible]. [illegible] : صَدُوْقٌ يَهِمُ كَثِيْرًا وَيُرْسِلُ وَيُدَلِّسُ [illegible], [illegible], [illegible]।

[illegible], [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible].-[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible].-[illegible]

[illegible], [illegible]. [illegible] :

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِى. وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ فَإِنَّهُ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ تَابِعِيٌّ جَلِيْلٌ رَوَى عَنِ الْعَبَادِلَةِ: اِبْنِ عُمَرَ وَاِبْنِ عَبَّاسٍ وَاِبْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، فَإِنْ كَانَ شَيْخُهُ ـ وَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّه ـ صَحَابِيًّا فَالسَّنَدُ صَحِيْحٌ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ كَمَا

هُوَ مَعْلُوْمٌ، وَإِنْ كَانَ تَابِعِيًّا، فَهُوَ مُرْسَلٌ لَا بَأْسَ بِهِ كَشَاهِدٍ، لِأَنَّهُ تَابِعِيٌّ مَجْهُوْلٌ، وَالْكِذْبُ فِى التَّابِعِيْنَ قَلِيْلٌ، كَمَا هُوَ مَعْرُوْفٌ.

অর্থাৎ হাদীসটিকে তাখরীজ করেছেন বায়হাকী। হাদীসটি শক্তিশালী সাক্ষী ও সমর্থক। কেননা , হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। আর আবদুল আযীয ইবনে রুফাই জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ তাবিঈগণের একজন। তিনি আবদুল্লাহগণ হতে তথা আবদুল্লাহ ইবন উমার , আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস , আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র প্রমুখ সাহাবী হতে এবং একদল জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ তাবিঈ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তো যদি তাঁর শাইখ -যাঁর নাম তিনি উল্লেখ করেননি - সাহাবী হন তাহলে সনদটি সহীহ। কারণ , সাহাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তাঁদের নাম উল্লেখ না করা ক্ষতির কোনো কারণ নয়। সকলের নিকট যেমনটা সুবিদিত। আর যদি তাবিঈ হন তাহলে হাদীসটি এমন মুরসাল যা সমর্থক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে অসুবিধা নেই। কেননা , ঐ তাবিঈ মাজহুল। আর তাবিঈগণের মধ্যে মিথ্যার চর্চা ছিল কম , যেমনটা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ।

শায়েখ আলবানীর এই বক্তব্যের সার কথা হল , হাদীসটির সকল রাবী যেহেতু নির্ভরযোগ্য সেহেতু আবদুল আযীয যদি হাদীসটি শ্রবণ করে থাকেন সাহাবী থেকে তাহলে হাদীসটির সনদ সহীহ। আর যদি তিনি হাদীসটি শ্রবণ করে থাকেন তাবিঈ হতে তাহলে তা এমন মুরসাল যা সমর্থক হাদীস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা , ঐ যুগে মিথ্যার চর্চা ছিল কম। কাজেই মারবী আনহু যদি তাবিঈ হন তবে তার পরিচয় জানা না গেলেও অর্থাৎ তিনি মাজহুল হলেও হাদীসটিকে যঈফ বলা যায় না।

তো আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ছিলেন প্রথম সারির তাবিঈ। সুতরাং প্রথমত এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে , তিনি হযরত বিলাল রা . কর্তৃক আযান ও ইকামতের বাক্যগুলোর বর্ণনাটি সরাসরি হযরত বিলাল রা . থেকে শুনেছেন। দ্বিতীয়ত এই সম্ভাবনাও প্রবল যে , তিনি কোনো সাহাবী থেকে বর্ণনাটি শুনেছেন। তা -ই যদি হয় তাহলে তখন হাদীসটির সনদ হবে সহীহ তথা হাদীসটি হবে সহীহ। আর যদি কোনো তাবিঈ হতে শুনে থাকেন তবে দ্বিতীয় সারির নয় , প্রথম সারির কোনো তাবিঈ হতেই তিনি তা শুনে থাকবেন সেই সম্ভাবনাটাই এখানে প্রবল। তাহলে আবদুল আযীযের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হলে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের মুরসাল বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। তাই নয় কি ? আমি মনে করি , হাদীসটি সহীহ। তিনি বিলাল রা . বা অন্য কোনো সাহাবী হতে বর্ণনাটি শুনেছেন। যদি কেউ এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে নিদেন পক্ষে হাদীসটিকে শক্তিশালী সমর্থক ও সাক্ষী হিসেবে বিবেচনার বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে পারে না। না , কোনোভাবেই না। ৩ [3]

জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত : হাদীস -৩

সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালাহ রাহ . বলেন :

سَمِعْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ مَثْنَى وَيُقِيْمُ مَثْنَى (أخرجه الطحاوي، رقم الحديث ٨٢٧)

আমি বিলাল রা .-কে আযান ও ইকামত দুইবার দুইবার করে বলতে শুনেছি। -ত্বহাবী , হাদীস ৮২৭

হাদীসটির উপর উত্থাপিত আপত্তি ও পর্যালোচনা

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ এই হাদীসটির উপর তিনটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন :

(ক) সুওয়ায়দ রাহ .ও তাবেঈ এবং তাঁর পক্ষেও বিলাল (রা) আযান শোনাটা পূর্বের বর্ণনাটির ন্যায় সম্ভব নয়।

(খ) এর সনদে শরীক বিন আবদুল্লাহ কাযী আছে। তিনি মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটিতে ‘আনআনাহ আছে। সুতরাং হাদীসটি যঈফ। তাছাড়া শরীকও হাদীসের ক্ষেত্রে ইখতিলাতকারী।

(ঘ) সর্বোপরি হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত বিলাল (রা) বর্ণনাটির বিরোধী বিধায় প্রত্যাখ্যাত।

মুহতারাম , আমার বক্তব্য হল , সুওয়াইদ রাহ .-ও প্রথম সারির একজন তাবিঈ ছিলেন। তিনি মুখাদরাম ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেদিন দাফন করা হয় ঠিক সেইদিনই তিনি মদীনাতে আগমন করেন। তিনি বলছেন , আমি বিলালকে শুনেছি জোড়া জোড়া বাক্যে আযান ও ইকামত দিতে। সুতরাং হাদীসটির সনদ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সুওয়াইদ রাহ . কর্তৃক বিলাল রা .-এর আযান ও ইকামত শোনাটাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। শুধু একটি প্রশ্ন থেকে যাবে যে , বিলাল রা . তো রাসূলের পরে মদীনাতে আর আযান দেননি তাহলে সুওয়াইদ রাহ . কী করে তাঁর আযান শুনলেন ? এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসব। প্রথমে দেখে নেই , হাদীসটির সনদ কিরূপ এবং কী কী আপত্তি এই সনদের উপর উত্থাপিত হয়েছে।

এই সনদটির উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শরীক ইবনে আবদুল্লাহ কাযী। তিনি মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটিতে আনআনাহ আছে। সুতরাং হাদীসটি

যঈফ। আপত্তিকারীকে বলছি, সিদ্ধান্ত তো খুব দ্রুত দিয়ে ফেললেন। আরেকটু তালাশ ও যাচাই করে সিদ্ধান্ত দিলে কি ভালো হত না? দেখুন, প্রথমত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ . তাঁর তাদলীস সম্পর্কে বলেছেন, وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيْسِ তিনি তাদলীস থেকে

সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতেন। এরপর দুইজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে,

তাঁরা শরীককে তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। প্রথমে করেছেন দারাকুতনী,

এরপর করেছেন আবদুল হক। হাফেজ সাহেবের বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদলীসের

অভিযোগটি তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই সম্ভবত হাফেজ সাহেব তাকরীবুত তাহযীবে তাঁর তাদলীসের কথাটি উল্লেখই করেননি। আল্লামা যাহাবীও তাঁর তাদলীস সম্পর্কে কিছু বলেননি। অথচ তাকরীবুত তাহযীব ও আলকাশেফ -এর প্রণেতাদ্বয় যথাক্রমে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা যাহাবী তাঁদের এই গ্রন্থদ্বয়ে

সাধারণত রাবীদের দোষ ও গুণসমূহের চুম্বকাংশই তুলে ধরেন। রাবীর তাদলীসের বিষয়টি

তার সমূহ দোষের মধ্য হতে একটি বড় দোষ। এই দোষটির কথা তাঁদের দুইজনের কেউ উল্লেখ করলেন না। এটি একটি বড় প্রমাণ যে, শরীকের ব্যাপারে উত্থাপিত তাদলীসের অভিযোগটি

তাঁদের দুইজনের কেউই আমলে নেননি। এটি একটি দুর্বল অভিযোগ। তবে হাঁ, তাবাকাতুল

মুদাল্লিসীন গ্রন্থে হাফেজ সাহেব তাঁর নামটিও তালিকাভুক্ত করেছেন। তবে সেখানে

তিনি তাঁকে দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিসগণের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। আর আমি আগেই

আলোচনা করে এসেছি যে, এই দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিসগণ কর্তৃক ‘আন দ্বারা বর্ণিত

হাদীস মুহাদ্দিসগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। কাজেই শরীকের হাদীসটি ‘আন দ্বারা বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটিকে যঈফ বলে দেওয়া মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের জ্ঞানের অপ্রতুলতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

আর শরীকের ইখতিলাত দোষের বিষয়টি অস্বীকার করার মত নয়। তবে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণের জ্ঞাতার্থে বলছি যে, তিনি ইখতিলাত -দোষের শিকার হয়েছিলেন ১৫০ হিজরীতে কুফার কাযী নিযুক্ত হওয়ার পরে। এর আগে নয়। দেখার বিষয় হল, এই হাদীসটি যে দুইজন

রাবী শরীক ইব্ন আবদুল্লাহর বরাতে বর্ণনা করেছেন তাঁরা শরীকের নিকট হতে ইখতিলাতের পূর্বে হাদীসটি শুনেছিলেন, না ইখতিলাতের পরে। বিষয়টি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা তো মুশকিল। তবে আমাদের অনুসন্ধান মতে মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান লুওয়াইন ১১৮ বা ১১৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইন্তিকাল করেন ২৪৫ বা ২৪৬ হিজরীতে। সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা গ্রন্থে আল্লামা যাহাবী আহমাদ ইবনুল কাসেম ইব্ন নাস্র এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আহমাদ ইবনুল কাসেম ইব্ন নাস্র বলেন,

حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ فِى سَنَةِ اَرْبَعِيْنَ وَمِئَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ اَبِى كَمْ لَكَ؟ قَالَ: مِأَةُ سَنَةٍ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.

অর্থাৎ লুওয়াইন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন দুইশত চল্লিশ সনে। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত? তিনি বললেন, ‘একশত তেরো বছর। তো দুইশত চল্লিশ সনে তাঁর বয়স একশত তেরো বছর হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর জন্ম হয়েছিল একশত সাতাইশ সনে। এ হিসেবে শরীক বিন আবদুল্লাহ আল কাযী ১৫০ হিজরীতে যখন কুফার কাযী নিযুক্ত হন তখন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান লুওয়াইন ছিলেন তেইশ বছর বয়সের টগবগে যুবক, যে বয়সে তৎকালের হাদীস চর্চাকারীগণ মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে যেতেন।
তদ্র ƒপ, আরেকজন রাবী মুহাম্মাদ ইবনে সিনান ইন্তিকাল করেন দুইশত তেইশ হিজরীতে। আর আল্লামা যাহাবী বলেন, ‘তিনি নব্বইয়ের উপর বয়স পেয়েছিলেন।’ অতএব, শরীক বিন আবদুল্লাহ আল কাযী ১৫০ হিজরীতে যখন কুফার কাযী নিযুক্ত হন তখন মুহাম্মাদ ইবনে সিনানের বয়স ছিল সতের বছরের বেশি। সুতরাং এই সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল যে, তাঁরা উভয়ে শরীকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন তাঁর ইখতিলাত-দোষে শিকার হওয়ার পূর্বে। আমাদের বন্ধুবর মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তাঁর সহযোগীদের সংগে নিয়ে এই সম্ভাবনার প্রাবল্য প্রমাণ করুন যে, তাঁরা উভয়েই শরীকের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁর ইখতিলাত-দোষে শিকার হওয়ার পরে, পূর্বে নয়।

বাকি রইল বিলাল রা. থেকে সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ রাহ.-এর শ্রবণের বিষয়টি। তো এ সম্পর্কে বলব যে, সহীহ সনদে যখন পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি বলেছেন, আমি বিলালকে আযান দিতে শুনেছি তখন এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া আমরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের হাদীস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, বিলাল রা. শামে গিয়েছিলেন হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে। সুতরাং সুওয়াইদ রাহ. কর্তৃক তাঁর থেকে হাদীস শোনার বিষয়টি একরকম নিশ্চিত বলেই বলা চলে। দেখুন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহর হাদীস সম্পর্কে শাওকানী রাহ. বলেছেন-

وَاسْتَدَلُّوْا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّحَاوِي مَنْ رِوَايَـةِ سُـوَيْدٍ بْنِ غَفَلَـةَ أَنَّ بِلَالًا كَـانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وِادَّعَى الْحَاكِمُ فِيْهِ الْاِنْقِطَـاعَ. قَـالَ الْحَافِـظُ : وَلَكِن فِي رِوَايَـةِ الطَّحَـاوِي سَـمِعْتُ بِلَالًا وَيُؤَيِّدُ ذَّلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَبْرٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ الْحَفْصُ عَنْ أَبِيْـهِ عَنْ جَـدِّهِ وَهُـوَ سَـعْدٌ اَلْقَرَظُ قَالَ : أَذَّنَ بِلَالٌ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عليه وآلـه وَسَـلَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْـرٍ فِي حَيَاتِـهِ وَلَمْ يُـؤَذِّنْ فِي زَمِانِ عُمَرَ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ هَاجَرَ فِي زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ.

اِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنّي الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ...

كَثِيْرُ التَّدْلِيْسِ

তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন গ্রন্থে তাঁকে দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিসের তালিকায়

উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস হচ্ছেন ঐ সকল রাবী যাঁদের

তাদলীসের পরিমাণ নেহায়েতই স্বল্প। যে কারণে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের তাদলীসকে সহনীয় বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁদের হাদীসকে তাঁরা তাঁদের সহীহ গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত

করেছেন। ইমাম মুসলিম রাহ সাঈদ ইবনে আবী আরূবাহ্র একাধিক মু‘আন‘আন হাদীসকে গ্রহণ

করেছেন। নমুনা স্বরূপ দেখুন ১২৭, ৩৪৭, ৪৯৮, ৯৩২, ১০৮৪, ১১১৯, ১২৮৭ ও ৫৬৬৩ নং হাদীস। এগুলোর কোনোটি তিনি কাতাদাহ থেকে, কোনোটি শাবাবাহ ইবনে সাওয়ার থেকে আবার কোনোটি

নাদ্র ইবনে আনাস থেকে ‘আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য যে, মুহাদ্দিসগণ একদল রাবীর নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, ‘এঁদের বরাতে সাঈদ ইবনে আবী আরূবাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁদের নিকট থেকে তিনি

হাদীস শ্রবণ করেননি।’ তাই যদি হয় তাহলে তো তা ইরসাল হবে, তাদলীস নয়। তাদলীস তো বলা হয় রাবী কর্তৃক এরূপ মারবী আনহুর বরাতে হাদীস বর্ণনা করা যে মারবী আনহু হতে তাঁর অন্যান্য হাদীস শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত, কিন্তু আলোচিতব্য কোনো একটি হাদীস তিনি মারবী আনহু হতে শ্রবণ করেননি, অথচ তিনি এরূপ শব্দ দ্বারা হাদীসটি

বর্ণনা করেছেন যদ্দারা মনে হয় যে, তিনি হাদীসটি মারবী আনহু হতে শ্রবণ করেছেন। যাঁর নিকট হতে কোনো হাদীস শ্রবণ প্রমাণিতই নয় তাঁর বরাতে ‘আন দ্বারা হাদীস

বর্ণনা করাকে ইরসাল বলা হয় তাদলীস নয়। হাঁ ইমাম বুখারী, ইবনে আদী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটিকে তাদলীস বললেও জুমহুর মুহাদ্দিস এটাকে তাদলীস বলেন না, ইরসাল

বলেন।

সাঈদ ইবনে আবী আরূবাহ-এর ইখতিলাত নিয়ে আলোচনা

আর তাঁর ইখতিলাতের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে এতটুকু বলব যে, হাঁ তিনি ইখতিলাতের শিকার হয়েছিলেন। তবে তাঁর শাগরিদ আবূ উসামাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর ইখতিলাতের পূর্বে হাদীস শুনেছেন। আর এজন্যই ইমাম মুসলিম রাহ. আবূ উসামাহ কর্তৃক বর্ণিত সাঈদ ইবনে আবী আরূবাহ্র হাদীস তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ

দেখুন , সহীহ মুসলিমের ৯৩২ , ৫৫৫০ ও ৭১১৭ নং হাদীস তিনটি। উপমহাদেশীয় ছাপা কিতাবে হাদীস তিনটি সন্নিবেশিত হয়েছে যথাক্রমে খ - ১ পৃষ্ঠা ১৭৩ , খ- ২ পৃষ্ঠা ২৯৩ ও ৩৫২ - এ।

ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ আরেকটি আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে , হাদীসটি ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল বর্ণনা। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই আপত্তির জবাব এই যে, মুহাদ্দিসগণের নিকট ইবরাহীম নাখাঈর দুইটি মুরসাল বর্ণনা ব্যতীত সকল মুরসাল বর্ণনা সহীহ। যেমনটা আব্বাস আদ -দূরী -এর বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন। আদ-দূরী বর্ণনা করেন , ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন :

وَمُرْسَلَاتُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ صَحِيْحَة إِلَّا حَدِيْثَ تَاجِر الْبَحْرَيْنِ وَحَدِيْثَ الضَّحْكِ فِي الصَّلَاةِ.

তাজেরুল বাহরাইন ও সালাতে হাসার কারণে ওযূ ভাঙা সংক্রান্ত হাদীস দুইটি ব্যতীত ইবরাহীম নাখাঈর সকল মুরসাল বর্ণনা সহীহ। -তারীখে ইবনে মাঈন , ভুক্তি নং ৯৫৮

আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার রাহ .-এর ভাষা দ্বারা তো বুঝা যায় যে , এটি শুধু ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন নয় বরং সকল মুহাদ্দিসের অভিমত। তিনি বলেন ,

فَمَراسِيْلُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ.

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব , মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল বর্ণনাসমূহ তাঁদের (তথা মুহাদ্দিসগণের) মতে সহীহ। -আত তামহীদ লিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মা 'আনী ওয়াল আসানীদ, খ- ১, পৃষ্ঠা ৩০

দলীল-৩

সাহাবীগণের শিষ্যগণ ইকামতের বাক্যগুলো দু 'বার করে বলতেন।

জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত : হাদীস -৫

আবূ ইসহাক রাহ . বলেন :

كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَ أَصْحَابُ عَبْدِ الله يَشْفَعُوْنَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ (أخرجه ابن أبي شيبة، رقم الحديث ٢١٥٤)

আলী রাযি.-এর শিষ্যগণ এবং আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ রাযি.)-র শিষ্যগণ আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলতেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস ২১৫৪

হাদীসটির উপর কৃত আপত্তি নিয়ে আলোচনা

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা ইন্টারনেটে হাদীসটির উপর আপত্তি উত্থাপন করে লিখেছেন: এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরতাত বর্ণনাকারী আছে। তিনি যদিও সত্যবাদী কিন্তু ব্যাপক ভুল করতেন, তিনি মুদাল্লিস। তাছাড়া তার শিক্ষক আবূ ইসহাক বর্ণনাতে ইখতিলাত (কমবেশী) করতেন। সর্বোপরি হাদীসটি যঈফ। যারা সনদটিকে সহীহ দাবী করেন তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে- হাজ্জাজ তার উস্তায থেকে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনাটি শুনেছেন। তর্কের খাতিরে সনদটিকে সহীহ ধরে নিলেও বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত নবী (স) এর সাথে সম্পৃক্ত মারফু' হাদীসের বিরোধী বিধায় পরিত্যাজ্য।

হাজ্জাজ সম্পর্কে তাকরীবুত তাহযীবে লিখিত বক্তব্য উদ্ধৃত করে দিয়েই গবেষণার এ্যানার্জি ফুরিয়ে গেল? তাহলে জেনে নিন যে, হাঁ হাজ্জাজ ইবন্ আরতাত মুদাল্লিস ছিলেন। তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস। কিন্তু এই স্তরের মুদাল্লিস রাবীর হাদীস শর্তহীনভাবে যঈফ হয়ে যায় না। আমরা জানি যে, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মুদাল্লিস রাবী যদি সত্যবাদী হন আর তিনি মারবী আনহু থেকে শুনেছেন বলে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়। (দ্রষ্টব্য: আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী প্রণীত 'তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন'-এর ভূমিকা।) এই কারণেই হাজ্জাজ ইবনুল আরতাত সম্পর্কে আবূ হাতেম রাযি বলেছেন,

اِذَا قَالَ حَدَّثَنَا فَهُوَ صَالِحٌ لَايُرْتَابُ فِي صِدْقِهِ وَحِفْظِهِ اِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ.

অর্থাৎ 'হাজ্জাজ যখন বলেন حَـدَّثَنَا (অমুকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছে) তখন তাঁর বর্ণনা হয় শুদ্ধ। তাঁর সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তিতে তখন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যখন তিনি শ্রবণ করেছেন বলে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন।'

এখন হাদীসটির সনদটি দেখুন, তিনি কীভাবে বর্ণনা করেছেন। সনদটি এইরূপ:

: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ ...

حدثنا أبو إسحاق, [illegible] حدثنا [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]? [illegible], '[illegible]'- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] '[illegible], [illegible], [illegible] حدثنا [illegible]! [illegible]!

[illegible] '[illegible]' [illegible]. [illegible] '[illegible]-

اَمَّا وَصْفُهُ بِكَثْرَةِ الْخَطَإِ فَمِنَ الْمُبَالَغَةِ

[illegible]

[illegible] :

اَحَدُ الْاَعْلَامِ عَلَى لِيْنٍ فِيْهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَخَلْقٌ، قَالَ الثَّوْرِي : مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ مِنْهُ، وَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : كَانَ أَفْهَمَ لِحَدِيْثِه مِنْ سُفْيَانَ، وَ قَالَ اَحْمَدُ : كَانَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ الْقَطَّانُ : هوَ وَ اِبْنُ اِسْحَاقَ عِنْدِي سَوَاءٌ. وَ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ : صَدُوْقٌ يُدَلِّسُ، فَاِذَا قَالَ حَدَّثَنَا فَهُوَ صَالِحٌ. وَ قَالَ النَّسَائي : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، مَاتَ [illegible] م قرنه [illegible]

অর্থাৎ কিছুটা দুর্বলতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি প্রবাদতুল্য

মুহাদ্দিসগণের একজন । তিনি বর্ণনা করেছেন ইকরিমা , ‘আতা থেকে। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু ‘বা ও আবদুর রাযযাক এবং আরও অনেকে। ছাওরী বলেন , কী বলা হচ্ছে তা জেনে বুঝে বলার ক্ষেত্রে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আর কেউ

বর্তমানে অবশিষ্ট নেই । হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন , সুফইয়ান অপেক্ষা হাজ্জাজ তাঁর

হাদীসের অধিক বোদ্ধা ছিলেন । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন , তিনি ছিলেন হাফেজে

হাদীসদের একজন। আলকাত্তান বলেছেন , হাজ্জাজ এবং ইবনে ইসহাক আমার মতে সমপর্যায়ের ।

আবূ হাতেম বলেন , সত্যনিষ্ঠ , তাদলীস করে থাকেন । সুতরাং তিনি যখন বলেন , حدثنا তখন

তিনি গ্রহণযোগ্য । নাসাঈ বলেন , শক্তিশালী নন ।

মুহতারাম , হাজ্জাজ সম্পর্কে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এবং আমার পর্যালোচনা দ্বারা

যে সার কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে , হাজ্জাজ কিছুটা দুর্বল রাবী ছিলেন । কিন্তু

তাঁর দুর্বলতা এই পর্যায়ের নয় যদ্দ ারা তাঁর হাদীসকে যঈফ বলা যায় । বরং তাঁর

হাদীস কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের । আলকাত্তান যেমনটা বলেছেন যে , হাজ্জাজ এবং ইবনে

ইসহাক তাঁর মতে সমপর্যায়ের । আর ইবনে ইসহাকের হাদীসকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য

করা হয়। ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত বেজোড় বাক্যে ইকামত সংক্রান্ত একটি হাদীসকে আমি হাসানই বলে এসেছি। আর হাজ্জাজের তাদলীসের বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি

যে, তিনি ছিলেন , তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস । যে স্তরের মুদাল্লিসগণ حدثنا শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করলে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

হাজ্জাজ সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতেম তেমনটাই বলেছেন ।

দলীল -৪

ইবরাহীম নাখাঈর ফতোয়া

হাদীস -৬

ইবরাহীম নাখাঈ বলেন ,

اَلْاَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى

আযান ও ইকামত দুইবার দুইবার করে। -ইমাম মুহাম্মাদ , কিতাবুল হুজ্জাহ ‘আলা আহলিল মাদীনাহ , পৃষ্ঠা ২২

ইবরাহীম নাখাঈর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান এবং তাঁর থেকে ইমাম আবূ হানীফা রাহ .। হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। তাঁকে যঈফ সাব্যস্তকরণ ধোপে টেকে না। তাঁর হাদীস কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের। আর আবূ হানীফা রাহ .-এর ব্যাপারে তো মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের এ্যালার্জি আছে। কাজেই তাঁর ব্যাপারে তাঁরা যাচ্ছে তা বলবেন তা জানা কথা। তবে মনে রাখতে হবে যে , চামচিকার চেঁচামেচিতে বা সারমেয়র ঘেউ ঘেউতে চাঁদের আলোর কোনো ক্ষতি হয় না , চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায় না। চাঁদের আলো সর্বদা উজ্জ্বলই থাকে। চাঁদ তার উজ্জ্বল ও ¯œগ্ধ আলোয় রাতের পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে, কমনীয় ও মোহনীয় করে তোলে।

ইবরাহীম নাখা ‘ঈর উক্তি

জোড় বাক্যে ইকামত : হাদীস -৭

ইবরাহীম নাখা ‘ঈ রাহ . বলেন :

لاَ تَدَعْ أَنْ تُثَنِّيَ الإِقَامَةَ ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলতে ছাড়বে না। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ , হাদীস ২১৫৩

এই হাদীসে একজন রাবী আছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা। তিনি আসলে মুহাম্মাদ ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী লায়লা। দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে বলা হয় মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা। তাঁর সম্পর্কে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ ইন্টারনেটে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন যে , তিনি যঈফ।

আমি বলব যে, হাঁ অনেকেই তাঁকে যঈফ বলেছেন। তবে কেউ কেউ তাঁকে বিশ^স্তও বলেছেন।

আল্লামা ইজলী বলেছেন, صَـدُوْقٌ ثِقَـةٌ তিনি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ^স্ত। দারাকুতনী তাঁর সুনানে (১/১২৪) বলেছেন, ثِقَةٌ فِي حِفْظِه شَيء তিনি বিশ্বস্ত, তবে তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কিছু সমস্যা ছিল। সকলের মতামতকে সামনে রেখে আল্লামা যাহাবী তাঁর তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে বলেছেন,

حَدِيْثُهُ فِي وَزْنِ الْحَسَنِ وَ لَايَرْتَقِيْ إِلى الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُتقِنِ عِنْدَهُمْ.

অর্থাৎ তার হাদীস হাসান মানের। সহীহের মানে তার হাদীস উন্নীত হবে না। কারণ, তিনি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সুদৃঢ় ছিলেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ তিনি সত্যনিষ্ঠ, দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। হাফেজ সাহেব তাঁর এই গ্রন্থে যে সকল রাবী সম্পর্কে صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদেরকে তিনি পঞ্চম স্তরের রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। যাদেরকে তিনি ষষ্ঠ স্তরের রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের সম্পর্কে তিনি মাকবূল শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর কিতাবটির ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মাকবূল শব্দটি তিনি তাদের সম্পর্কেই ব্যবহার করেছেন যাদের থেকে খুব স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাদের এমন কোনো দোষের প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে দোষের কারণে তাদের হাদীসকে বর্জন করা যায়। তবে এটা তখনই যদি তাদের হাদীসের মুতাবি‘ বা সমর্থক হাদীস পাওয়া যায়। নতুবা তাদের সম্পর্কে তিনি لَيِّنُ الْحَدِيْثِ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সপ্তম স্তর থেকে তিনি শুরু করেছেন যঈফ শব্দসহ অন্যান্য শব্দের ব্যবহার। যে শব্দগুলো রাবীর হাদীসকে যঈফ, মাতরূক, জাল বলে নির্দেশ করে। দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ স্তরের মাকবূল রাবীর হাদীসকেও তিনি শর্ত নিরপেক্ষভাবে যঈফ বলে মনে করেন না। তিনি মাকবূল রাবীর হাদীসকে যঈফ বলে গণ্য করেন তখন যখন তার হাদীসের কোনো মুতাবি‘ পাওয়া না যায়। অতএব এর এক স্তরের উপরের রাবী - যার সম্পর্কে তিনি صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ শব্দ ব্যবহার করেন তার হাদীসকে যে তিনি শর্তনিরপেক্ষভাবে যঈফ বলে মনে করেন না তা আর বলার অপেক্ষা

রাখে না। আর এ কারণেই তিনি তাঁর نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّ مُحَمَّدًا ابْنَ أَبِي لَيْلَى صَدُوْقٌ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ.

অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা সত্যনিষ্ঠ, যদিও কেউ কেউ তাঁকে তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে যঈফ বলেছেন।' (নাতাইজুল আফকার খ- ১, পৃষ্ঠা ১৩৭)

মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লাকে তাঁর স্মৃতিশক্তির বিবেচনায় কেউ কেউ যঈফ বললেও তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ - হাফেজ ইবনে হাজার রাহ.-এর এই ভাষা ইঙ্গিত করে যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লাকে ঢালাওভাবে বা শর্তনিরপেক্ষভাবে যঈফ বলার পক্ষপাতি নন। তাঁর হাদীসকে প্রাসঙ্গিক লক্ষণাবলী দ্বারা যঈফ সাব্যস্ত করা যেতে পারে, কারণ তিনি দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অপরদিকে প্রাসঙ্গিক লক্ষণাবলী দ্বারা তাঁর হাদীস হাসান স্তরেরও হয়ে যেতে পারে।

আমি মনে করি, মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লার হাদীসকে শর্তনিরপেক্ষভাবে হাসান বলে ব্যক্তকৃত আল্লামা যাহাবীর মতের সঙ্গে যেমন সহমত পোষণ করা যায় না তেমনই তার হাদীসকে শর্তনিরপেক্ষভাবে যঈফ বলে যাঁরা মত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের সঙ্গেও সহমত পোষণ করা যায় না। বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানকেই শ্রেয় বলে মনে করি। অর্থাৎ মনে করি যে, তাঁর হাদীস অন্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হলে তাঁর সেই হাদীসকে হাসান বলা যায়। অপরদিকে তাঁর হাদীস অন্য হাদীসের জন্য সমর্থক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাঁর হাদীস এরূপ হাসান নয়, যা স্বতন্ত্র দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আবার এরূপ যঈফ নয়, যা বর্জনযোগ্য। বরং এরূপ যঈফ, যা গ্রহণযোগ্য।

ইকামত সংক্রান্ত ইবরাহীম নাখাঈর যে উক্তিটি ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সহীহ; কেননা, আমরা আগেই বলেছি যে, উক্তিটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর তা যেহেতু মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লার সনদে বর্ণিত ইবরাহীম নাখাঈর উক্তি সংক্রান্ত বর্ণনাটিকে সমর্থন করে এবং জোরালোভাবে সমর্থন করে সেহেতু মুহাম্মাদ ইবনে আবী লায়লার বর্ণনাটিকে হাসান হিসাবে গ্রহণ না করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

দলীল-৫

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible],

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَـةً، الأَذَانُ : اللَّهُ أَكْبَـرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ... وَالإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَـرُ، اللَّهُ أَكْبَـرُ، اللَّهُ أَكْبَـرُ، اللَّهُ أَكْبَـرُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُـولُ اللـهِ، حَيَّ عَلَى الصَّـلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَـدْ قَـامَتِ الصَّـلاَةُ، قَـدْ قَامَتِ الصَّـلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَـرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

[illegible]

[illegible]

কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে , রাবী তাঁর বর্ণনায় তারজী 'র বিষয়টাকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

জোড় বাক্যে ইকামত : হাদীস -৯

আবূ মাহযূরা রা . বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً.

অর্থাৎ আবূ মাহযূরা রা . বলেন যে , নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযানের বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন ১৯টি এবং ইকামতের বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন ১৭টি। - জামে তিরমিযী , হাদীস ১৯২ ; সুনানে দারিমী , হাদীস ১১৯৬ , ১১৯৭; নাসাঈ , হাদীস ৬৩০

আবূ মাহযূরাহ রা .-এর উপরিউক্ত হাদীস দুটির রাবীগণের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে , মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ তাঁদের কারও উপর কোনো অন্যায় আক্রমণ করেননি। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণের স্বভাবসুলভ আচরণের দাবি অনুযায়ী তাঁদের এই কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল যে , হাদীস দুটির অমুক রাবী মুদাল্লিস , তমুক রাবী ইখতিলাতের শিকার , অমুক রাবী যঈফ ইত্যাদি। এটা শুধু হাদীস দুটির রাবীগণের জন্যই সৌভাগ্যজনক নয় বরং মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণের জন্যও সৌভাগ্যজনক। কারণ , হাদীসের রাবীগণকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করার দ্বারা নিজের জন্য জাহান্নামের পথ সুগম করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না।

তবে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ ইন্টারনেটে হাদীস দুটির একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা ও জবাব দাঁড় করেছেন। তাঁরা বলেছেন ,

(ক) উক্ত হাদীসে দুই অশহাদু দুইবার করে বলার পর পুণরায় দুইবার বলা হয়েছে। একে বলা হয় তারজী আযান। ফলে আযানের মোট বাক্য হয় ১৯টি। কিন্তু হানাফীদের কাছে এই তারজী আযান গ্রহণযোগ্য নয়। আবার তারাই তারজীযুক্ত আযানের সাথে সম্পৃক্ত ইকামতটি মেনে থাকেন। যা তাদের স্ববিরোধী নীতি। অর্থাৎ মনমত হলে তারা হাদীস গ্রহণ করেন , অন্যথায় বর্জন করেন।

(খ) যখন আযান তারজী হবে তখন ইকামত জোড়া হবে। অর্থাৎ যে মুয়াযযিন তারজী তথা ১৯ বাক্যের আযান দিবেন তিনি জোড়া তথা ১৭ বাক্যের ইকামত দিবেন। বুঝা গেল , সর্বাবস্থায় আযানের বাক্য থেকে ইকামতের বাক্য সংখ্যা কম হবে।

(গ) যেহেতু হানাফীগণ তারজী আযান অস্বীকার করে থাকেন এবং বলেন: এটা সাহাবী আবূ মাহযুরাহ (রা) এর শেখানোর জন্য ছিল। সেহেতু উক্ত ইকামতের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যাই তাদের পক্ষ থেকে আসা উচিত।

(ঘ) যেহেতু আযানের ক্ষেত্রে হানাফীরা সহীহ মুসলিমের সাহাবী বিলাল (রা) থেকে তারজীহীন আযানের অনুসরণ করেন সেহেতু ইকামতের ক্ষেত্রে ঐ হাদীসের বেজোড় বাক্যকে গ্রহণ করবেন। অন্যথায় তাদের আমল ও দলীল তাদের বিপক্ষে যায়।

(ক) চিহ্নযুক্ত বক্তব্যের এক পর্যায়ে তাঁরা বলেছেন, কিন্তু হানাফীদের কাছে এই তারজী আযান গ্রহণযোগ্য নয়। আমি বলব যে, মুযাফফর বিন মুহসিন মহোদয়গণ! কথা বলতে বা লিখতে আপনাদের আরও পড়াশোনার প্রয়োজন আছে। হানাফীরা তারজীযুক্ত আযানকে কখনওই অগ্রহণযোগ্য বলেন না। তাঁরা তারজীযুক্ত আযানকেও গ্রহণযোগ্য বলেন, কিন্তু তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তারজীবিহীন আযানকে, ব্যস এই পর্যন্তই। তারজীযুক্ত আযানকে তাঁরা গ্রহণযোগ্যতার গ-ি থেকে কখনওই বের করে দেননি। তাঁদের পরিবেশিত তথ্যটি তাঁরা কোথায় পেলেন তা তাঁরা জানাবেন কি?

(খ) চিহ্নযুক্ত বক্তব্যে তাঁরা যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন সেই মূলনীতিটি তাঁরা কোন্ হাদীসে পেয়েছেন তাঁরা বলবেন কি?

মুহতারাম, আপনার মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে, প্রবাদতুল্য ও অনন্যসাধারণ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুমাল্লাহ) উভয়েই আবূ মাহযূরাহ রা.-এর তারজীযুক্ত আযানকে প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু ইকামতের ক্ষেত্রে তাঁরা বিলাল রা.-এর বেজোড় বাক্যের ইকামতকে প্রাধান্য দান করেছেন। তারজীযুক্ত আযান আর জোড় বাক্যের ইকামত যদি একটি আরেকটির জন্য অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা তারজীযুক্ত আযানকে গ্রহণ করে জোড় বাক্যের ইকামতকে পরিহার করলেন কেন? আর তারপরও মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ অভিযোগের তীর শুধু হানাফীদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন কেন? হানাফীদের ব্যাপারে তাঁদের এত এ্যালার্জি কেন? হানাফীদের সবকিছুতেই তাঁদের এত গা জালা কেন?

(গ) চিহ্নযুক্ত বক্তব্যে তাদের প্রথম বাক্যের জবাবে বলব, না, হানাফীরা তারজীযুক্ত আযানকে অস্বীকার করেন না। তাঁরা শুধু তারজীবিহীন আযানকে তারজীযুক্ত আযানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ব্যস এই পর্যন্তই। উভয় ধরনের আযানকেই তাঁরা শরীয়তসম্মত মনে করেন। কোনোটাকেই সুন্নাহ-বহির্ভূত বলেন না। এরপর মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণের দাবি হল, হানাফীরা যেহেতু বলেন, এটা (তথা তারজীযুক্ত আযান) আবূ

মাহযূরাহকে শেখানোর জন্য ছিল সেহেতু তাঁর ইকামতের ব্যাপারেও সেই ব্যাখ্যাই তাঁদের থেকে আসা উচিত।

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, প্রথম কথা হল, ফিকহে হানাফীর কিতাব হিদায়াহতে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। আরও ব্যাখ্যা আছে সেটি পরে বলছি। হিদায়াহ প্রণেতার ব্যাখ্যাকে মেনে নিলেও বলব যে, আযানের ক্ষেত্রে ঐ ব্যাখ্যা দ্বারা এটা অপরিহার্য হয় না যে, ঐ একই ব্যাখ্যা ইকামতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে বলতে হবে। তার কারণ, আবূ মাহযূরাহ রা.-কে শেখাতে গিয়ে তাঁকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ চারবার করে বলিয়েছিলেন তার কারণ, আবূ মাহযূরাহ রা. আযানের বাক্য নিয়েই ঠাট্টা করছিলেন। ইকামতের বাক্যগুলো নিয়ে নয়। সুতরাং একই ব্যাখ্যা ইকামতের বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা হল এইরূপ: রাসূলুল্লাহ যখন আবূ মাহযূরাহ রা.-কে আযান শিক্ষা দেন তখন আবূ মাহযূরাহ রা. ছিলেন ছোট্ট বালক। হুনায়নের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন যখন আযান দিচ্ছিলেন তখন এই ছোট্ট বালক তার বালসুলভ স্বভাব অনুযায়ী মুয়াযযিনের বাক্যগুলোকে ঠাট্টাস্বরূপ উচ্চারণ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে স্নেহভরে কাছে ডেকে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে বলেন। উভয় বাক্য দুই দুইবার করে নিম্নস্বরে তাঁকে দিয়ে উচ্চারণ করান। এর ফলে আবূ মাহযূরাহর অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। এরপর আবার তাঁকে দিয়ে দুই দুইবার করে উভয় বাক্য উচ্চস্বরে উচ্চারণ করান। প্রথমে দুইবার আস্তে উচ্চারণ করানোর দ্বারা রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল, আবূ মাহযূরাহর অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা, ঈমানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা এবং ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া। আর এই উদ্দেশ্য সফল করতে উচ্চস্বরের তুলনায় নিম্নস্বরে উচ্চারণ করানোটা ছিল অধিক ফলপ্রসূ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। হযরত আবূ মাহযূরাহ রা. এরই বরকতে ইসলাম গ্রহণ করার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এরপর দুইবার করে উচ্চস্বরে বাক্যদুটিকে বলতে বলেছিলেন আযানের অংশ হিসাবে। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে মক্কার মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন তখন তিনি আবূ মাহযূরাহ রা.-এর আযানে শাহাদাতাইনকে তথা দুই আশহাদুকে চারবার করেই রেখে দিয়েছিলেন। কারণ এরই বরকতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ফলে তারজীযুক্ত আযান

হয়ে গিয়েছিল একমাত্র আবূ মাহযূরাহ রা.-এর জন্য বিশেষ রীতি। ব্যাপকভাবে সকলের জন্য নয়। তাই আমরা তারজীযুক্ত আযানের উপর ব্যাপক রীতির আযান তথা দুইবার করে আশহাদু বলার রীতিকে প্রাধান্য দান করেছি। কিন্তু ইকামতের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, আবূ মাহযূরাহ রা. ইকামতের সময় কোনো ঠাট্টা করেননি। তাঁকে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আযানের উৎস আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর দেখা স্বপ্নের ইকামত অনুযায়ী। বাকি রইল এই প্রশ্ন যে, তাহলে বিলাল রা.-কে ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কেন? কেন তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর স্বপ্ন অনুযায়ী জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত শিক্ষা দেওয়া হল না?

মুহতারাম, এর প্রকৃত হিকমত ও রহস্য তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই জানেন। তবে আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও এই হিকমতের কথা ব্যক্ত করি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা সৃষ্টি করেছেন, উভয় পদ্ধতিকেই সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। ওয়াল্লাহু আ‘লাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

(ঘ) চিহ্নযুক্ত করে যে আপত্তি মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ উত্থাপন করেছেন তার জবাব হবে (খ) চিহ্নযুক্ত তাদের বক্তব্যের জবাবের অনুরূপ। দেখুন, ইমাম মালেক রাহ. ও ইমাম শাফিঈ রাহ.-এর ন্যায় প্রবাদপুরুষ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ আযানের ক্ষেত্রে আবূ মাহযূরাহ রা.-এর তারজীযুক্ত আযানকে প্রাধান্য দান করেছেন কিন্তু তাঁরা ইকামতের ক্ষেত্রে আবূ মাহযূরাহ রা.-এর ইকামতকে প্রাধান্য দান না করে বেজোড় বাক্যের ইকামতকে প্রাধান্য দান করেছেন। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না কেন যে, তাঁরা যখন আযানের ক্ষেত্রে আবূ মাহযূরাহর তারজীযুক্ত আযানের অনুসরণ করেন সেহেতু তাঁদের উচিত ছিল আবূ মাহযূরাহ রা.-এর জোড় বাক্যের ইকামতের অনুসরণ করা। তবে আমরা এরূপ গর্দভ-মস্তিষ্কজাত আপত্তি উত্থাপন করতে চাই না। কারণ, আমি আগেই বলেছি যে, তারজীযুক্ত বা তারজীবিহীন আযানের সাথে জোড় বাক্যের ইকামত বা বেজোড় বাক্যের ইকামত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। একটি আরেকটিকে অপরিহার্য করে তোলে না। তারজীযুক্ত আযানও সুন্নাহসম্মত, তারজীবিহীন আযানও সুন্নাহসম্মত। জোড় বাক্যে ইকামতও সুন্নাহসম্মত, বেজোড় বাক্যে ইকামতও সুন্নাহসম্মত। যে মুজতাহিদ যেটিকে প্রাধান্য দান করেছেন তো করেছেন। তাতে আপত্তির কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।

[1] ১ যার মধ্যে ইরজা রয়েছে তাকে মুরজী বলা হয় , অনেকের ক্ষেত্রে মুরজিয়া। মুরজী শব্দটি অপরিচিত বলেই এখানে একজনের ক্ষেত্রেও বহুর শব্দ মুরজিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যে অর্থে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রাহ .-কে মুরজী বলা হয়েছে , তা কোনো বিদআতী মতবাদ নয়। বরং তা অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিসের অভিমত । যদিও এ বিষয়ে ২য় ও ৩য় শতাব্দীর অধিকাংশ মুহাদ্দিসের ভিন্ন মত ছিল । হাফিজুল হাদীস ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী তার কিতাব সিয়ারু আলামিন নুবালায় বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন । এমনকি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের জীবনীতেও (খ- : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৩) তিনি লিখেছেন , والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله (আবদুল মালেক)

[2] ২ ‘তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ’ কথাটি আবু হাতিম রাহ .-এর উস্তায ইবনে মায়ীনের অভিমত বিরোধী। এমনকি তার উস্তাযের উস্তায ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আলকাত্তানের অভিমতেরও বিরোধী। ইমাম আবু হানীফা রাহ ., ইমাম আবু ইউসুফ রাহ . ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ . সহ হাদীস ও ফিকহের অনেক ইমামই তার হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ . যখন ‘সিয়ারে ’ আবু হাতিম রাহ .-এর উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তখন তাঁর বক্তব্যের এই অংশটুকু ছেড়ে দিয়েছেন। দেখুন , ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা ’ খ- : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৪ (আবদুল মালেক)

[3] ৩ মাওলানা আব্দুল গাফফার দামাত বারাকতুহুম এখানে ছাড় দিয়ে কথা বলেছেন । আসল কথা হল, আসওয়াদ রাহ. হযরত আবু বকর রা ., হযরত উমর রা ., হযরত মুআয বিন জাবাল রা .সহ অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত উমর রা .-এর সাথে তিনি হজ্জের সফর করেছেন । হযরত উমর রা .-এর যমানায় তার মদিনা মুনাওয়ারার সফরও ইতিহাসে প্রমাণিত । তাই হযরত বিলাল রা .-এর সাথে তার সাক্ষাতের বিষয়টি একেবারেই স্বভাবিক । তাছাড়া তিনি হযরত বিলাল রা . থেকে বর্ণনাও করেছেন । দেখুন , সুনানে নাসায়ী , হাদীস ৬৪৯। তাতে এই হাদীসটিই সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ইবরাহীম থেকে বর্ণনাকারী হলেন আমাশ । আমাদের জানা মতে হাদীসের কোনো ইমাম এ বর্ণনাকে মুরসাল বা মুনকাতি বলেননি। আর না কোনো ইমাম ইরসাল বা

[illegible] أن بلالا [illegible] عن بلال قال [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه قَالَ : حَدّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : لَمّا أَمَـرَ رَسُـولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- بِالنّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنّـاسِ لِجَمْـعِ الصـلاَةِ طَـافَ بِي وَأَنَـا نَـائِمٌ رَجُـلٌ يَحْمِـلُ نَاقُوسًا فِى يَدِه فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصّلاَةِ. قَالَ أَفَلاَ أَدُلّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى. قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَـرُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاّ

إِلَهَ إِلاّ اللّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاّ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ، أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا رّسُولُ اللّـهِ، أَشْـهَدُ أَنّ مُحَمّـدًا رّسُـولُ اللّـهِ، حَيّ عَلَى الصّلاَةِ حَيّ عَلَى الصّـلاَةِ، حَيّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللّـهُ أَكْبَـرُ اللّـهُ أَكْبَـرُ، لاَ إِلَـهَ إِلاّ اللّـهُ. قَـالَ : ثُمّ اسْتَأْخَرَ عَنّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصّلاَةَ : اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاّ اللّـهُ، أَشْـهَدُ أَنّ مُحَمّدًا رّسُولُ اللّهِ، حَيّ عَلَى الصّلاَةِ، حَىّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، اللّهُ أَكْبَرُ اللّـهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ. فَلَمّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُـهُ بِمَـا رَأَيْتُ فَقَـالَ : إِنّهَـا لَرُؤْيَا حَقّ إِنْ شَاءَ اللّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذّنْ بِهِ فَإِنّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أُمِرِ بِلَالٌ أَنْ يّشْـفَعَ الْأَذان وَيُـوتِرَ الْإِقَامَـةَ. زَادَ يَحْـيى فَي حَدِيْثِـه عَنِ ابْنِ عُلَيّـةَ فَحَـدّثْتُ بِـهِ أَيّـوْبَ فَقَـالَ إِلاّ الْإِقَامَةَ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

إِنّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَـرّتَيْنِ مَـرّتَيْنِ وَالإِقَامَـةُ مَـرّةً مَـرّةً، غَيْـرَ أَنّـهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ. فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضّأْنَا ثُمّ خَرَجْنَا إِلَى الصّلاَةِ.

[illegible]

أَنّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ.

حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدّثَنِى أَبِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه أَنّ أَذَانَ بِلَالٍ...

(সা ‘দ) তাঁর পিতা (আম্মার) থেকে, আর তাঁর পিতা আম্মার তাঁর (তথা সা ‘দের) পিতামহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন সা ‘দ থেকে , বিলালের আযান ছিল দুই বাক্যে এবং ইকামত ছিল এক বাক্যে।

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন সা ‘দ কর্তৃক।

অথচ মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ লিখেছেন , রসূলূল্লাহ (স) এর মুয়াযযিন আম্মার ইবনে সা ‘দ (রা)-এর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে প্রশ্ন হল , ‘রসূলুল্লাহ (স) এর মুয়াযযিন ’ বিশেষণটি কার বিশেষণ ? আম্মারের , না আম্মারের পিতামহের ? বিশেষণটি এদের দুইজনের যার জন্যই সাব্যস্ত করা হোক তা নিশ্চিতরূপে ভুল। কারণ , না আম্মার রাসূলের মুয়াযযিন ছিলেন , না আম্মারের পিতামহ তাঁর মুয়াযযিন ছিলেন। আর তা ছাড়া না আম্মার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ পেয়েছেন , না আম্মারের পিতামহ ‘আইয মুসলমান ছিলেন।

যাদের জ্ঞানের থলি এতটা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ তারা যে কেন হাদীসের গবেষণায় নেমে মুজতাহিদ বনে যাওয়ার খাহেশ পোষণ করেন তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আল্লাহ তাআলা এদেরকে সুমতি দান করুন।

হাদীসটি নিঃসন্দেহে যঈফ। এর সনদে আবদুর রহমান ও তাঁর পিতা সা ‘দ দুইজনই যঈফ।

বেজোড় বাক্যে ইকামত : হাদীস -৫

আবূ রাফে ‘ বলেন,

رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيْمُ وَاحِدَةً

আমি বিলাল রা .-কে দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযান দিতে দুইবার দুইবার , আর ইকামত একবার একবার। -সুনানে ইবনে মাজাহ , হাদীস ৭৩২ ; দারাকুতনী , হাদীস ৯৩৪

এই হাদীসটি সকলের মতে যঈফ। হাদীসটির দুজন রাবী মা ‘মার ইবনে মুহাম্মাদ এবং তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন উবাইদুল্লাহ মুহাদ্দিসগণের মতে চরম দুর্বল। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখছি না। কারণ , মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণও হাদীসটিকে যঈফ

বলে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন , হাদীসটি যঈফ। কিন্তু পূর্বের সহীহ হাদীসগুলোর সাক্ষ্যমূলক হিসাবে হাদীসটি হাসান। এ কথার অর্থ যে কী , তার মাথামু -ু কিছুই বুঝলাম না। কোনো যঈফ হাদীস কোনো সহীহ হাদীসের সাক্ষী ও সমর্থক হলে তা হাসান হয়ে যায় - এই নীতির প্রবক্তা কোনো মুহাদ্দিস ও শাস্ত্র -বিশেষজ্ঞ আছেন বলে আমাদের জানা নাই।

বেজোড় বাক্যে ইকামত : হাদীস -৬

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার রা . বলেন,

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنى مَثْنى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযান ছিল দুইবার দুইবার এবং ইকামত একবার একবার। -সুনানে আবূ দাউদ , হাদীস ৫১০ ; সুনানে নাসাঈ , হাদীস ৬২৮ , ৬৬৮; সহীহ ইবনে খুযায়মাহ , হাদীস ৩৭৪

হাদীসটিতে দুইজন রাবী আছেন আবূ জাফর আল মুআযযিন ও আবুল মুছান্না মুসলিম ইবনুল মুছান্না নামে। এই দুইজন সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রজ্ঞগণের পক্ষ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারের মন্তব্যই পাওয়া যায়। ফলে হাদীসটিকে যঈফ না বললেও সহীহ বলা যায় না। বড় জোর হাদীসটিকে হাসান বলা যায়। যেহেতু মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ হাদীসটিকে হাসান বলেই স্বীকার করেছেন তাই রাবী দুইজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না।

মুহতারাম , আপনার সামনে দুই দুই বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত হাদীস এবং এক এক বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত হাদীস - এই উভয় প্রকার হাদীসই তুলে ধরা হল। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তাঁর 'জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত ' বইটিতে এক এক বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্য হতে মাত্র দুইটি হাদীস উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে মাওলানা আবদুল মতিন ছাহেবের 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল ' বইটির জবাব লিখতে গিয়ে তিনি বা তাঁর অনুসারী কেউ ইন্টারনেটে আরও কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমি তাদের উপস্থাপিত সব কয়টি হাদীসই আপনার সামনে তুলে ধরলাম। বেজোড় বাক্যে ইকামতের পক্ষে চারটি দলীলে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আর জোড় বাক্যে ইকামতের পক্ষে পাঁচটি দলীলে আটটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

উভয়পক্ষের হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা

বেজোড় বাক্যে ইকামত দান সংক্রান্ত হাদীসগুলোর দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ; প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠ হাদীসদুইটি হাসান এবং চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীসদুইটি যঈফ। আর জোড় বাক্যে ইকামত দান সংক্রান্ত হাদীসগুলোর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম হাদীসসাতটি সহীহ আর পঞ্চম ও সপ্তম হাদীসদুইটি হাসান। হাদীসগুলো পাঠ করার পর আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, জোড় বাক্যে তথা দুই দুই বাক্যে ইকামত দান সম্পর্কে যেমন সহীহ ও হাসান হাদীস রয়েছে তেমনি বেজোড় বাক্যে তথা এক এক বাক্যে ইকামত দান সম্পর্কেও সহীহ ও হাসান হাদীস রয়েছে। কাজেই কোনোটাকেই সুন্নাহ বিরোধী বলার অবকাশ নেই। তবে আমরা জোড় বাক্যে ইকামত দানের পদ্ধতিটিকে প্রাধান্য দান করেছি নি¤œ লিখিত সমূহ কারণে।

(ক) যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. কর্তৃক দেখা স্বপ্নের আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো শরীয়তে বিধিবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, তাঁর দেখা স্বপ্নটিই ছিল প্রচলিত আযান ও ইকামতের উৎস। আর সেই স্বপ্নের ইকামতের বাক্যগুলো ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে।

আপনি বলতে পারেন যে, বেজোড় বাক্যে ইকামত হাদীস ১ শিরোনামে উদ্ধৃত আবূ দাউদের ৪৯৯ নং হাদীস দ্বারা তো বুঝা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর স্বপ্নে দেখা ইকামতের বাক্যগুলো ছিল একবার করে। এই আপত্তি ও তার জবাব নিয়ে আমি পূর্বে ‘জোড় বাক্যে ইকামত হাদীস ১’-এর অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। একটু কষ্ট করে আলোচনাটি আবার পাঠ করুন (আলকাউসার জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি./ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈ. সংখ্যা)। অবশ্য ইবনে হাযম রাহ. দাবি করেছেন যে, জোড় বাক্যে ইকামত দানের বিধানটি ছিল প্রথম দিকে। পরবর্তীতে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। তাঁর এই দাবি সম্পর্কে পূর্বে বলেছিলাম যে, এ নিয়ে পরে আলোচনা করব। তো বলছি যে, ইবনে হাযমের এই দাবি যথার্থ নয়। তার কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে নবম হিজরীতে হযরত আবূ মাহযূরাহ রা.-কে জোড় বাক্যে ইকামত দিতে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং যদি নাসিখ ও মানসূখের বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় তাহলে বরং বিষয়টি উল্টো করে বলতে হবে যে, বেজোড় বাক্যে ইকামত দানের বিধানটিই মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। নাসিখ হল, হযরত আবূ মাহযূরাহ রা.-এর জোড় বাক্যে ইকামত সংক্রান্ত হাদীস। কারণ, আবূ মাহযূরাহ রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[illegible]

[illegible]

وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحّحَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيْثِ بِلَالٍ الّذِيْ فِيْهِ الْأَمْرُ بِإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ لِأَنّهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكّةَ لِأَنّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَبِلَالٌ أُمِرَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَوّلَ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ فَيَكُوْنُ نَاسِخًا. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ الشّيْخِ (أَنَ بِلَالًا أَذّنَ بِمِنَى وَرَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّمَ ثَمّ مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ) إِذَا عَرَفْتَ هَذَا تَبيّنَ لَكَ أَنّ أَحَادِيْثَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ صَالِحَةٌ لِلْاِحْتِجَاجِ بِهَا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ وَأَحَادِيْثُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَصَحّ مِنْهَا لِكَثْرَةِ طُرُقِهَا وَكَوْنِهَا فِيْ الصّحِيْحَيْنِ لكِن أَحَادِيْثَ التّثْنِيَةِ مُشْتَمِلَة عَلَى الزِّيَادَةِ فَالْمَصِيْرُ إِلَيْهَا لَازِمٌ لَا سِيِّمَا مَعَ تَأَخّرِ تَارِيْخِ بَعْضِهَا كَمَا عَرفْنَاكَ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَقدْ أَجَابَ الْقَائِلُوْنَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ عَنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مِحْذُوْرَةَ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا : إِنّ مِنْ شَرْطِ النّاسِخِ أَنْ يّكُوْنَ أَصَحّ سَنَدًا وَأَقْوَمَ قَاعِدَةً وَهَذَا مَمْنُوْعٌ فَإِنّ الْمُعْتَبَرَ فِي النّاسِخِ مُجَرّدُ الصِّحّةِ لَا الْأَصَحِّيّةُ وَمِنْهَا أَنّ جَمَاعَةً مِّنَ الْأَئِمّةِ ذَهَبُوْا إِلَى أَنّ هَذِهِ اللّفْظَةُ فِيْ تَثْنِيةِ الْإِقَامَةِ غَيْرُ مَحْفُوْظَةٍ وَرَوَوْا مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ كَمَا ذَكَرَ ذلِكَ الْحَازِمِيّ فِي النّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيْخِه وَالدّارَقُطْنِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَهَذَا الْوَجْهُ غَيْرُ نَافِعٍ لِأَنّ الْقَائِلِيْنَ بِأَنّهَا غَيْرُ مَحْفُوْظَةٍ غَايَةُ مَا اعْتَذَرُوْا بِه عَدَمُ الْحِفْظِ وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمّةِ كَمَا تَقَدّمَ وَمَنْ عَلِمَ حُجّةٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ. وَأَمّا رِوَايَةُ إِيْتَارِ الْإِقَامَةِ عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ فَلَيْسَتْ كَرِوَايَتِه التّشْفِيْعَ عَلَى أَنّ الْاِعْتِمَادَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلى الزِّيَادَةِ.

وَمِنَ الْأَجْوِبَةِ أَنّ تَثْنِيةَ الْإِقَامَةِ لَوْ فُرِضَ أَنّها مَحْفُوْظَةٌ وَأَنّ الْحَدِيْثَ بِهَا ثَابِتٌ لَكَانَتْ مَنْسُوْخَةً فَإِنّ أَذانَ بِلَالٍ هُوَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وِسَلّمَ لَمّا عَادَ مِنْ حُنَيْنٍ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ أَقَرّ بِلَالًا عَلى أَذَانِه وَإِقَامَتِه. قَالُوْا : وَقَدْ قِيْلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَلَيْسَ حَدِيْثُ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ بَعْدَ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ لِأَنّ حَدِيْثَ أَبِيْ مَحْذُوْرَةِ بَعْدَ فَتْحَ مَكّةَ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَأَقَرّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهَذَا أَنْهَضُ مَا أَجَابُوْا بِـهِ وَلَكِنّهُ مُتَوَقّفٌ عَلَى نَقْلٍ صَحِيْحٍ أَنّ بِلَالًا أَذّنَ بَعْدَ رُجُوْعِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ الْمَدِيْنَةَ وَأَفْرَدَ الْإِقَامَةَ وَمُجَرّدُ قَوْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ لَا يَكْفِيْ فَإِنْ ثَبَتَ

ذَلِكَ كَانَ دَلِيْلًا لِمَذْهَبِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْكُلِّ وَيَتَعَيَّن الْمَصِيْرُ إِلَيْهَا لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ عَقِبَ الْآخَرِ مُشْعِرٌ بِجَوَازِ الْجَمِيْعِ لَا بِالنَّسْخِ.

অর্থাৎ, বেজোড় বাক্যে ইকামতের প্রবক্তাগণ আবূ মাহযূরাহর হাদীসের বেশ কিছু জবাব দিয়েছেন। সেসব জবাবের একটি হল এই: নাসিখ হওয়ার জন্য শর্ত হল, সনদগত দিক থেকে নাসিখকে হতে হবে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং কায়দার দিক থেকে অধিকতর সঠিক।

এই বক্তব্যটি ঠিক নয়। কেননা, নাসিখের ক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্যযোগ্য তা হচ্ছে শুধু বিশুদ্ধ হওয়া, অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়া নয়।

জবাবসমূহের আরেকটি হল এই যে, ইমামগণের একদল এই মত ব্যক্ত করেন যে, জোড় বাক্যে ইকামতের ক্ষেত্রে এই শব্দ মাহফূয ও সংরক্ষিত নয়। এবং তাঁরা আবূ মাহযূরাহর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, আযান জোড়া বাক্যে দিতে এবং ইকামত বেজোড় বাক্যে দিতে। যেমনটা হাযিমী তাঁর গ্রন্থ 'আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ'-এ উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটিকে তাখরীজ করেছেন ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং আরও তাখরীজ করেছেন দারাকুতনী ও ইবনে খুযায়মাহ।

জবাবের এই দিকটি (তাদের জন্য) লাভজনক নয়। কারণ, যাঁরা বলেন যে, ঐ শব্দের বর্ণনা মাহফূয নয় তাঁদের এই অজুহাতের সর্বোচ্চ কথা হল, সংরক্ষিত না থাকা। অথচ অন্যান্য ইমামগণ ঐ শব্দকে সংরক্ষণ করেছেন। পূর্বে যেমনটা বিবৃত হয়েছে। আর যে জানে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে হুজ্জত, যে জানে না। বাকি রইল আবূ মাহযূরাহর সূত্রে বর্ণিত বেজোড় বাক্যের ইকামতের বর্ণনাটি। তো সেটি তাঁর কর্তৃক বর্ণিত জোড় বাক্যে ইকামতের বর্ণনার সমপর্যায়ের নয়। তা ছাড়া নির্ভরস্থল হল, ঐ বর্ণনাটি যা অতিরিক্ত বিষয় ধারণ করে।

তাঁদের জবাবসমূহের আরেকটি জবাব হল, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জোড় বাক্যে ইকামত সংক্রান্ত আবূ মাহযূরাহর হাদীসটি সংরক্ষিত এবং তা প্রমাণিত তবুও বলতে হবে যে, সেটা মানসূখ হয়ে গেছে। কারণ, বিলালের আযান ছিল দুটো ঘটনার (আবূ মাহযূরাহর আযান ও বিলালের আযান) শেষ ঘটনা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়ন হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বিলাল রা.-কে তাঁর (পূর্ব) আযান ও ইকামতের উপর বহাল রাখেন। তাঁরা বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ-কে বলা হল, আবূ মাহযূরাহর হাদীস কি বিলালের হাদীসের পরে নয়? কেননা, আবূ মাহযূরার হাদীসটি তো মক্কা বিজয়ের পরের হাদীস? জবাবে আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহ. বললেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে বিলালকে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের আযানের উপর বহাল রাখেননি?

তাঁদের জবাবসমূহের মধ্য হতে এই জবাবটি অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী। কিন্তু এটা নির্ভর করে এই বিশুদ্ধ বর্ণনার উপর যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরে বিলাল রা. আযান দিয়েছিলেন এবং বেজোড় বাক্যে ইকামত দিয়েছিলেন। শুধু আহমাদ ইবনে হাম্বালের উক্তি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অভিমতের পক্ষে এটি একটি দলীল হবে যাঁরা উভয়রকমের ইকামতের বৈধতার কথা বলেন। কেননা, দুটির প্রত্যেকটির একটির অপরটির পরে হওয়া উভয়প্রকারের বৈধতার কথা জানান দেয়, না নাস্খ বা রহিত হওয়ার কথা।’

মুহতারাম, লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই যে, যাঁরা আবূ মাহযূরাহর হাদীসের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন আল্লামা শাওকানী রাহ. প্রথমে তাঁদের জবাবগুলোকে একটি একটি করে বর্ণনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিটি জবাবের পর ঐ জবাবকে খ-ন করতে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। স্বাভাবিক বর্ণে লিখিত কথাগুলো তাঁদের, যাঁরা আবূ মাহযূরাহর হাদীসের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। আর ইটালিক করা অংশগুলো আল্লামা শাওকানীর বক্তব্য। আল্লামা শাওকানী তাঁদের শেষ জবাবের যে প্রতিজবাব দিয়েছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁদের এই জবাবটি উভয়টাই আমলযোগ্যতার ও বৈধতার প্রমাণ বহন করে; আবূ মাহযূরাহর হাদীসটির মানসূখ হওয়া প্রমাণ করে না। আল্লামা শাওকানীর মূল কথা এই যে, বিলাল রা.-এর বেজোড় বাক্যে ইকামতদানের বিধানটিই মানসূখ হয়ে গেছে। এরপর আবূ মাহযূরাহর হাদীস সম্পর্কে যাঁরা বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন তাঁদের জবাবের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, তাঁদের জবাবটি বেশির চেয়ে বেশি এই কথা প্রমাণ করে যে, উভয়টাই আমলযোগ্য; এটা প্রমাণ করে না যে, আবূ মাহযূরাহর হাদীসটি মানসূখ।

আল্লামা শাওকানীর বক্তব্য মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা বুঝতে পারেননি। ফলে তাঁরা তাঁর বক্তব্য নিয়ে যে মন্তব্য বা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা হ য ব র ল হয়ে গেছে।

তবে আল্লামা শাওকানী রাহ. বিলাল রা.-এর বেজোড় বাক্যের ইকামতকে মানসূখ বলে যে দাবি করেছেন তা আমি সমর্থন করি না। আবার ইবনে হাযমসহ অন্যান্যরা আবূ মাহযূরাহর হাদীসকে যে মানসূখ বলেছেন তাও সমর্থন করি না। কারণ, শুধু পরবর্তিতা নাসিখ হওয়ার একটা লক্ষণ মাত্র, নিশ্চিত কোনো দলীল নয়। কোনো হাদীস বা আমলকে অপর কোনো হাদীস বা

আমলের জন্য নাসিখ হিসাবে সাব্যস্ত করতে হলে আরও যেসব প্রমাণ ও লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তা এখানে অনুপস্থিত।

তা ছাড়া আবূ মাহযূরাহ রা .-কে জোড়া বাক্যে ইকামতদান শিক্ষা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন বিলাল রা .-এর বেজোড় বাক্যে ইকামতদানকে বহাল রাখেন বলেই অনুমিত হয়। এটি সুনিশ্চিত না হলেও সম্ভাবনাযুক্ত তো বটে। অপরদিকে বিলাল রা . কর্তৃক রাসূলের ইন্তিকালের পরে জোড় বাক্যে ইকামতদানের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। কাজেই এখানে কোনোটাকেই কোনোটার জন্য নাসিখ বলা এবং অপরটিকে মানসূখ বলার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। বরং উভয়টিকেই আমলযোগ্য মনে করি। তবে আমরা জোড় বাক্যের ইকামতকে আমলের জন্য নির্বাচন কেন করলাম সে আলোচনাই করছিলাম। তার একটি কারণ উল্লেখ করেছি (ক) চিহ্ন যুক্ত করে। এরপর আরও কারণ উল্লেখ করছি।

(খ) হযরত বিলাল রা .-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্ন অনুযায়ী আযান ও ইকামত দিতে বলেছিলেন। আর তাই তিনিও বেশ কিছুদিন জোড়া জোড়া বাক্যেই ইকামত দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে বেজোড় বাক্যে ইকামত দিতে বলেছিলেন তা ছিল আরও পরের ঘটনা। বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসে যেটি বলা হয়েছে যে , বিলাল রা . এক এক বাক্যে ইকামত দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন তা পরবর্তীকালের ঘটনা। প্রথমে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রাব্বিহির দেখা স্বপ্নের বাক্যগুলো দিয়েই ইকামত দিতেন।

কেউ বলতে পারে যে , হযরত বিলাল রা . প্রথম থেকেই ইকামত একবার করে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর দলীল হল , হযরত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীস -

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ.

অর্থাৎ , হযরত আনাস বলেন, লোকেরা আগুন ও নাকূসের উল্লেখ করল তো সঙ্গে সঙ্গে তারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের কথাও স্মরণ করল। ফলে বিলালকে নির্দেশ দেওয়া হল আযান জোড়া বাক্যে দিতে এবং ইকামত এক বাক্যে দিতে। -সহীহ বুখারী , হাদীস ৬০৩ , ৬০৬; সহীহ মুসলিম , হাদীস ৮৬৫

[illegible]

[illegible]

أَنّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَـانَ الْمُسْـلِمُوْنَ حِيْنَ قَـدِمُوْا الْمَدِيْنَـةَ يَجْتَمِعُـوْنَ فَيَتَحَيّنُـوْنَ الصّـلَاةَ لَيْسَ يُنَـادَى لَهَـا فَتَكَلّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اِتّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَـرْنِ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصّلَاةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلّمَ يَـا بِلَالُ قُمْ فَنَـادِ بِالصّلَاةِ.

[illegible]

[illegible]

তাছাড়া এই হাদীসের قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ (যাও, সালাতের আহ্বান জানাও) কথাটির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন,

قَوْلُهُ (فَنَادِ بِالصَّلَاةِ) فِىْ رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيْلِى "فَأَذِّنْ بِالصَلَاةِ " قَالَ عِيَاضٌ اَلْمُرَادُ اَلْإِعْلَامُ الْمَحضُ بِحُضُوْرِ وَقْتِهَا لَاخُصُوْصُ الْأَذَانِ الْمَشْرُوْعِ.

অর্থাৎ ইয়ায বলেছেন, এটা দ্বারা ‘সালাতের জামাতের সময় হয়েছে’- এই বিষয়টি জানান দেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। প্রচলিত ও বিধিবদ্ধ আযানের মাধ্যমে আহ্বান জানানো বুঝানো হয়নি।

ঐ সময়ে যে শব্দ দ্বারা বেলাল রা. সালাতের জামাতের সময় হওয়ার কথা জানান দিতেন তা কী ছিল ? তো সে সম্পর্কে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ.-এর একটি মুরসাল হাদীস তবাকাতে ইবনে সা‘দ-এ বিবৃত হয়েছে যে, তা ছিল الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (সালাতের জামাত শুরু হতে যাচ্ছে)। -ফাতহুল বারী, খ- ২, পৃষ্ঠা ১০২, ১০৩, প্রকাশক : দারুল হাদীস, কায়রো

ইবনে হাজার রাহ. আরও বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنّ إِشَارَةَ عُمَرَ بِإِرْسَالِ رَجُلٍ يُنَادِيْ لِلصَلَاةِ كَانَتْ عَقِبَ الْمُشَاوَرَةِ فِيْمَا يَفْعَلُوْنَهُ، وَ إِنّ رُؤْيَا عَبْدِ اللـهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ بَعْدَ ذالِكَ.

অর্থাৎ স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে এই যে, উমার রা. কর্তৃক সালাতের আহ্বান জানাতে কোনো ব্যক্তিকে পরামর্শদানটা ছিল তারা কী করবে সে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের পরে। আর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নটি ছিল এরও পরে। -ফাতহুল বারী, খ- ২, পৃষ্ঠা ১০২

অতএব এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, হযরত বিলাল রা.-কে বেজোড় বাক্যে ইকামত দান করার নির্দেশ দেওয়ার ঘটনাটি ছিল পরবর্তীকালের ঘটনা। প্রথমে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ কর্তৃক দেখা স্বপ্নের বাক্যগুলো দিয়েই আযান ও ইকামত দিতেন। আর সে ইকামত ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে।

এইজন্যই পূর্বে বলেছিলাম যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থের যে হাদীসের কথা আপত্তিকারী বলেছেন তা আযানের ইতিহাস সংক্রান্ত নয়। সেটি ভিন্ন প্রকৃতির হাদীস। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্ন সংক্রান্ত হাদীস বাহ্য দৃষ্টিতে ঐসব হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে শায হতে পারে না। কোনো হাদীসকে শায বলা যায় তখন, হাদীসটির সনদের সকল রাবী ছিকাহ হওয়া সত্ত্বেও যখন সেটি হয় দলবিচ্ছিন্ন বর্ণনা। কিংবা হাদীসটির সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও যখন হাদীসটির

বক্তব্য হয় বিচ্ছিন্ন একটি বক্তব্য, যার কোনো সমর্থন অন্য কোনো বর্ণনা দ্বারা পাওয়া যায় না এবং যেটিকে তার বিরোধী হাদীসের সাথে কোনোভাবেই সমন্বয় করা যায় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে এইসব কারণের কোনো একটিকেও দেখতে পাচ্ছি না।

আমার পুরো আলোচনাটি পাঠ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেজোড় বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত হাদীসটির সঙ্গে জোড় বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত হাদীসসমূহের কোনো বিরোধ নেই। কাজেই জোড় বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত প্রত্যেকটি হাদীসের জবাবে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা যে দাবি করেছেন যে, হাদীসটি সহীহ মুসলিমের সহীহ হাদীসের বিরোধী বিধায় শায ও পরিত্যাজ্য তা যুক্তিতে টেকে না।

(গ) হযরত বিলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় প্রথম দিকে যেমন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর স্বপ্নে দেখা বাক্যগুলোর অনুসরণে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিতেন তেমনই রাসূলের ইন্তিকালের পরেও তিনি জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিয়েছেন। সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। বিশিষ্ট তাবিঈ ইবরাহীম নাখাঈর একটি মুরসাল বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, বিলাল রা. জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিতেন। আর পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি যে, ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, বিলাল রা. প্রথমে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিলেও পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে বেজোড় বাক্যে ইকামত দিতে আদেশ করলেন আর তিনিও রাসূলের জীবদ্দশার পুরো সময়টা বেজোড় বাক্যে ইকামত দিলেন তখন রাসূলের ইন্তিকালের পর তিনি রাসূলের আদেশ অমান্য করে কেন জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিলেন?

এই প্রশ্নের জবাবে বলব যে, এই বেশিটি তো সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণিত যে, বেলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত বেজোড় বাক্যেই ইকামাত দিয়েছেন। তাছাড়া বেলাল রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল শিক্ষাকে সামনে রেখে বুঝেছিলেন যে, বেজোড় বাক্যে ইকামত দেওয়া যেমন সুন্নাহসম্মত তেমনই জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দেওয়াটাও সুন্নাহসম্মত। কারণ, তিনি জানতেন যে, মক্কার মুআযযিন আবূ মাহযূরাহ রা.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আবূ মাহযূরাহ রা. সারা জীবন সেইমতেই জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিয়েছেন। এবং খোদ তিনিও রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে মিনাতে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিয়েছিলেন। যেমনটি আবুশ শায়েখের বরাতে শাওকানী রাহ. উল্লেখ করেছেন। কাজেই জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিলে তাতে রাসূলের আদেশ লংঘিত হবে না।

(ঘ) সাহাবীগণের বহু শিষ্যের আমল ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দেওয়া। যেমনটা আমরা জানতে পেরেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ও আলী রা.-এর শিষ্যগণ জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিতেন।

(ঙ) সেই সঙ্গে ইবরাহীম নাখাঈর উক্তি ও ফতোয়া আমাদের জানান দেয় যে, তাবিঈগণের মধ্যে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দেওয়ার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

(চ) হুনায়নের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আবূ মাহযূরাহ রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষদিকের ঘটনা।

সারকথা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. যে আযান ও ইকামত স্বপ্নে দেখেছিলেন সেই আযান ও ইকামত উভয়টি ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে। (আমাদের দেশে ঐ আযান ও ইকামতই প্রচলিত।) হযরত বিলাল রা. আযান ও ইকামতের সূচনালগ্ন থেকে বেশ কিছুদিন জোড়া জোড়া বাক্যেই ইকামত দিয়েছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও তিনি জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিয়েছিলেন বলে প্রামাণ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবীগণের শিষ্যগণও জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামত দিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সহীহ সনদে বিখ্যাত তাবিঈ ইবরাহীম নাখাঈর উক্তি ও ফতোয়া পাওয়া যাচ্ছে জোড়া জোড়া বাক্যে ইকামতদানের পক্ষে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁর কর্তৃক মক্কায় নিয়োজিত মুয়াযযিন হযরত আবূ মাহযূরাহ রাযি-কে যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল জোড়া জোড়া বাক্যে। ইত্যাদি কারণে আমরা জোড়া জোড়া বাক্যের ইকামতকে প্রাধান্য দান করেছি। এবং সেই অনুযায়ীই আমরা আমল করছি। কিন্তু আমরা মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের ন্যায় ভিন্ন আমলকে তথা বেজোড় বাক্যে ইকামতদানের উপর আমল করাকে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ইত্যাদি বলি না।

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তাঁর বইতে একদিকে বলেছেন ইকামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয, তবে বেজোড় বাক্যে দেওয়া উত্তম। অপরদিকে তিনি বা তাঁর পক্ষালম্বীরা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوْيَهْ وَغَيْرُهُمَا مِنْ جَوَازِ إِفْـرَادِ الْإِقَامَـةِ وَتَثْنِيتِهَـا هُـوَ الْقَـوْلُ الـرّاجِحُ الْمَعْمُوْلُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عِنْدِيْ

فَمَنْ شَفَّعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَـدْ أَحْسَـنَ وَمَنْ أَوْجَبَ هَـذَا دُوْنَ هَـذَا فَهُـوَ مُخْطِئٌ ضَـالٌّ وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُوْنَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ.

وَكُلّ هَذَا مَنَ التّفَرّقِ وَالْاخْتِلَافِ الّذِي نَهَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ عَنْهُ، وَكُلّ هَؤُلَاءِ الْمُتَعَصِّبِيْنَ بِالْبَاطِـلِ الْمُتّبِعِيْنَ الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ، الْمُتّبِعِيْنَ لِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ، مُسْتَحِقُّوْنَ لِلذّمِّ وَالْعِقَابِ.

ইকামত দেওয়াকে সুন্নাহ-বিরোধী বলে মনে করেন না, নাকি মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা?

কথা শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। কারণ, মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের ধারণা অনুযায়ী বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থাকতে অন্য কিতাবের হাদীসের দিকে ধাবিত হওয়া ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। এখন করছি।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বিপরীতে অন্য কিতাবের হাদীস দ্বারা দলীলগ্রহণ কি ভ্রষ্টতা?

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ লিখেছেন: আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখাব আমাদের লেখক (‘দলীলসহ নামাযের মাসায়েল’ বইয়ের লেখক আবদুল মতীন সাহেব) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যের বিরোধিতায় কিভাবে ইবনে আবী শাইবাহ, তাহাবী, অন্যান্য সুনান ও মুসনাদের গ্রন্থকে ব্যবহার করেছেন, যা সুস্পষ্ট বিদআত ও মুমিনদের বিরোধী পথ (সূরা নিসা: ১১৫)। উল্লেখ্য, কুরআনের দাবী অনুযায়ী যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তা পরস্পর বিরোধী হবে না (সূরা নিসা: ৮২)। নবী (স) এর হাদীস অনুযায়ী কিতাবের একাংশকে অপরাংশ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে বিতর্ক অবস্থায় রাখা যাবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এর কিছু পরে তাঁরা লিখেছেন: আসুন এখন আমরা দেখি কিভাবে সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় এই উম্মতের ধ্বংসপ্রাপ্তরা যঈফ ও জাল হাদীস উপস্থাপন করে।

মুহতারাম, এরা সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বিরোধিতায় ইবনে আবী শাইবাহ, তাহাবী, অন্যান্য সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থের হাদীস উপস্থাপন করাকে সুস্পষ্ট বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এর পক্ষে দলীল হিসাবে তারা সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতের বরাত দিয়েছে। আপনি একটু কষ্ট করে দেখুন তো সূরা নিসার ঐ আয়াতে কোথায় বলা হয়েছে যে, বুখারী ও মুসলিমের বিরোধিতায় ঐ সকল গ্রন্থের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ সুস্পষ্ট বিদআত? কুরআনের ঐ আয়াতটি কি তাহলে রাসূলের ইন্তিকালের সোয়া দুইশত বছর পরে বুখারী মুসলিম সংকলিত হওয়ার পর নাযিল হয়েছে? সুবহানাল্লাহ! এরা যে কিরকম জালিয়াতির আশ্রয় নিতে পারে এটি তার একটি জ¦লন্ত নিদর্শন। আয়াতটিতে এ কথা বলা হয়েছে যে, (তরজমা) “সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই পরিচালিত করব যে পথ সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করাবো এবং জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।”

বুখারী ও মুসলিমে সব সহীহ হাদীস নেই

মুহতারাম , অনেকের মত মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরাও সম্ভবত এই ধারণা পোষণ করেন যে , বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে সহীহ হাদীস নেই। থাকলেও তা বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসের সমপর্যায়ের সহীহ নয়। এই কারণে কোনো বিষয়ে হাদীস পেশ করা হলে বলে , হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে নেই , বুখারী মুসলিমের হাদীস দেখান। কিংবা বলে, এর বিপরীতে বুখারী মুসলিমে যে হাদীস আছে তা অধিকতর সহীহ।

এটা উসূলুল ফিকহ ও উসূলুল হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত কথা। এইসব আল্লাহর বান্দাহরা যদি এ সম্পর্কে খোদ বুখারী ও মুসলিমের বক্তব্য কী তা জানার চেষ্টা করত তাহলে এইরূপ কথা বলত না। কারণ খোদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ . পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে , তাঁরা তাঁদের কিতাবুস সহীহতে সব সহীহ হাদীস সংকলন করেননি। তার ইচ্ছাও করেননি। কথাটি উভয় ইমাম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

ইমাম বুখারী রাহ . বলেছেন ,

مَا أَدْخَلْتُ فِى كِتَابِيْ "اَلْجَامِعِ" إِلّا مَا صَح وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّوْلِ.

আমি আমার কিতাবুল জামি ‘তে শুধু সহীহ হাদীস এনেছি। তবে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় (বহু) সহীহ হাদীস আনা থেকে বিরত থেকেছি। -ইবনে আদী, আল কামিল, খ- ১, পৃষ্ঠা ২২৬; খতীব বাগদাদী , তারীখে বাগদাদ , খ- ২, পৃষ্ঠা ৮ -৯

‘শুরূতুল আইম্মাতিল খামছা ’য় (পৃষ্ঠা ১৬০ -১৬৩) ইমাম ইসমাঈলীর সূত্রে ইমাম বুখারীর বক্তব্যের আরবী পাঠ এইরূপ :

لَمْ أُخَرِّجْ فِيْ هَذَا الْكِتَابِ إِلّا صَحِيْحًا وَمَاتَرَكْتُ مِنَ الصّحِيْحِ أَكْثَرُ

আমি এই কিতাবে শুধু সহীহ হাদীস এনেছি। আর যে সহীহ হাদীস আনিনি তার সংখ্যা বেশি।

বুঝা গেল , ইমাম বুখারী মনস্থ করেছিলেন , তাঁর কিতাবে তিনি যা আনবেন তা হবে সহীহ হাদীস। কিন্তু তিনি এই মনস্থ করেননি যে , সব সহীহ হাদীস তিনি তাঁর কিতাবে আনবেন। সব সহীহ হাদীস আনার ইচ্ছাও করেননি , আনেনওনি। অনেক সহীহ হাদীস তাঁর কিতাবের বাইরে রয়ে গেছে।

ইমাম মুসলিমের ব্যাপারটিও একই রকম। তিনিও তাঁর কিতাবে সব সহীহ হাদীস আনার ইচ্ছাও করেননি, আনেনওনি। খতীব বাগদাদী রাহ. ‘তারীখে বাগদাদে’ (খ- ১২, পৃষ্ঠা ২৭৩, তরজমা: আহমদ ইবনে ঈসা আততুসতুরী) এবং হাযেমী ‘শুরূতুল আইম্মাতিল খামসা’য় (পৃষ্ঠা
১৮৫) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ যুর‘আ রাযী রাহ. (ইমাম মুসলিম রাহ.-এর উস্তায) একবার সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বললেন, এর দ্বারা তো বিদ‘আতপন্থীদের জন্য পথ খুলে দেওয়া হল। তাদের সামনে যখন কোনো হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, এ তো কিতাবুস সহীহতে নেই।

আবূ যুর‘আ রাযী রাহ. বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সব সহীহ হাদীস তো সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়নি। কাজেই কিতাবের নামের সাথে যখন সহীহ কথাটি যুক্ত করা হয়েছে তখন এর দ্বারা পরবর্তীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে এবং মানুষ সহীহ মুসলিমে কোনো হাদীস না পেলে সেটা সহীহ হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে গ্রহণ করতে চাইবে না- শুধু এই অজুহাতে যে, হাদীসটি সহীহ মুসলিমে নেই। আবূ যুর‘আ রাযীকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়র দান করুন। তিনি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। না হলে আমরাও হয়তো মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের মত তার আশংকা অনুযায়ী বিদআতপন্থী হয়ে যেতাম।

আরও দেখুন, ইমাম ইবনে ওয়ারা রাহ.ও সরাসরি ইমাম মুসলিমকে সম্বোধন করে এই আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন। তখন ইমাম মুসলিম রাহ. বলেছিলেন, ‘আমি এই কিতাব সংকলন করেছি এবং বলেছি, এই হাদীসগুলো সহীহ। কিন্তু আমি তো বলিনি যে, এ কিতাবে যে হাদীস নেই তা যঈফ।’

অতএব বোঝা গেল যে, অন্যান্য গ্রন্থেও সহীহ হাদীস আছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

একমাত্র বুখারী ও মুসলিমের হাদীসই কি অধিকতর বিশুদ্ধ? আর অন্যান্য গ্রন্থের সব হাদীসই কি বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের তুলনায় নিম্নমানের?

এই প্রশ্নের এক কথায় জবাব হল, ‘না’। কারণ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তো তাঁদের নিজেদের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ অনেক হাদীসই তাঁদের কিতাবে আনেননি। দেখুন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ বর্ণিত কোনো হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে আনেননি। কেন আনেননি সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলী রাহ. (৩৭১ হি.) ‘আল মাদখাল ইলাল মুসতাখরাজ ‘আলা সহীহিল বুখারী’তে বলেছেন, ‘বুখারী তো তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ অনেক সহীহ হাদীসও বর্ণনা করেননি। তবে তা এ জন্য নয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে হাদীসগুলো যঈফ

কিংবা সেগুলোকে তিনি বাতিল সাব্যস্ত করতে চান। তো হাম্মাদ ইবনে সালামাহ বর্ণিত কোনো হাদীস তাঁর কিতাবে না আনার বিষয়টিও সেরকমই। ' -আন নুকাত 'আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ , বদরুদ্দীন যারকাশী , খ- ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৩

ইমাম আবূ নু 'আইম আসপাহানী রাহ. (৪৩০ হি .) 'আল মুসতাখরাজ 'আলা সহীহি মুসলিম '-এ একটি হাদীসের মান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ,

فَإِنَّهُمَا رَحِمَهُمَا الله قَدْ تَرَكَا كَثِيْرًا مِّمَّا هُوَ بِشَرْطِهِمَا أَوْلى وَإِلى طَرِيْقَتِهِمَا أَقْرَبُ.

'বুখারী মুসলিম এমন অনেক হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন , যেগুলো তাঁদের সংকলিত হাদীস অপেক্ষাও তাঁদের নীতি ও মানদণ্ডের অধিক নিকটবর্তী। ' -আল মুসতাখরাজ, খ- ১, পৃষ্ঠা ৩৬

বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে এরূপ বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ের বা বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। শুধু মুসতাদরাকে হাকেমেই এই পর্যায়ের হাদীস , হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ .-এর বক্তব্য অনুযায়ী হাজারের কাছাকাছি। -আন নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ

মুসনাদে আহমাদ এখন ৫২ খণ্ডে বিস্তারিত তাখরীজসহ প্রকাশিত হয়েছে। টীকায় শায়েখ শুআইব আলআরনাঊত রাহ. ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ সনদের মান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা -এর উচ্চতর হাদীস বিভাগের একজন ছাত্র শুধু প্রথম চৌদ্দ খণ্ডের হাদীসের হিসাব করেছেন , তো দেখা গেছে যে , সহীহ বুখারী , সহীহ মুসলিম , সুনানে আবূ দাউদ , জামে তিরমিযী , সুনানে নাসাঈ , সুনানে ইবনে মাজাহ - এই ছয় কিতাবে নেই এমন হাদীসগুলোর মধ্য হতে ৪০১টি হাদীস রয়েছে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী। শুধু বুখারীর শর্ত অনুযায়ী আছে ৬৪টি , শুধু মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী আছে ২১৫টি।

এ ছাড়া সহীহ লিযাতিহী বা সহীহ লিগাইরিহী হাদীসের সংখ্যা ১০০৮টি। হাসান লিযাতিহী বা হাসান লিগাইরিহী হাদীসের সংখ্যা ৬১৫টি। এসব সংখ্যা স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত হাদীসসমূহের , অর্থাৎ যেগুলোর কোনো মুতাবি ' বা শাহিদ তাখরীজের বিবরণ অনুযায়ী ছয় কিতাবে নেই।

দেখুন, শায়েখ আলবানী রাহ. ‘সিফাতুস সালাহ’ (নবীজীর নামাযের পদ্ধতি) সম্পর্কে যে কিতাব লিখেছেন তাতে ছয় কিতাবের বাইরে ৮৬টি হাদীস রয়েছে। এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বাইরে সুনানের কিতাবের হাদীস রয়েছে ১৫৬টি।

স্বয়ং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ. তাঁদের অন্যান্য কিতাবে এমন অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন বা দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তাঁদের এই দুই কিতাবে নাই। নিশ্চিত হতে চাইলে ‘জুযউল কিরাআতি খালফাল ইমাম’ এবং ‘জুযউ রাফইল ইয়াদাইন’ ইত্যাদি কিতাব খুলে দেখতে পারেন। জামে তিরমিযী খুললেও দেখতে পাবেন, ইমাম তিরমিযী রাহ. ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে এমন অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন, যা সহীহ বুখারীতে নেই।

সুতরাং অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসগুলোকে শুধু এই অজুহাতে পরিত্যাগ করা যে, এগুলো বুখারী মুসলিমে নেই অর্বাচিনতা ছাড়া কিছু নয়। কাজেই মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ কর্তৃক বুখারী ও মুসলিমের বিরোধিতায় অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস উপস্থাপন করাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করণ অতপর তাঁদের এই উক্তি ‘আসুন আমরা দেখি কিভাবে সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় এই উম্মতের ধ্বংসপ্রাপ্তরা যঈফ ও জাল হাদীস উপস্থাপন করে’ তাঁদের অজ্ঞানতা বা জ্ঞানপাপিতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

তাকসীমে সাবঈ নিয়ে আলোচনা

অনেক অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণও এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, বুখারী ও মুসলিমের হাদীস সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য। তাঁরা তাঁদের এই চিন্তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন সপ্তম শতাব্দীতে তৈরিকৃত ‘তাকসীমে সাবঈ’কে। আর এ সম্পর্কে তিনি শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাকসীমে সাবঈ অর্থ সাত প্রকারে বিভক্তকরণ। সম্ভবত মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ রাহ. (৬৪৬ হি.) সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রকাশ করেন যে, সহীহ হাদীস সাত প্রকার এবং প্রত্যেক উপরের প্রকার নীচের প্রকারের চেয়ে তুলনামূলক বেশি সহীহ। প্রকারগুলো এই:

১. যে হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম দুই কিতাবেই আছে।

২. যে হাদীস শুধু বুখারীতে আছে।

৩. যে হাদীস শুধু মুসলিমে আছে।

৪. যে হাদীস এই দুই কিতাবে নেই তবে এই দুই কিতাবের মানদণ্ডে সহীহ।

৫. যে হাদীস শুধু বুখারীর মানদণ্ডে সহীহ।

৬. যে হাদীস শুধু মুসলিমের মানদণ্ডে সহীহ।

৭. যে হাদীস না এই দুই কিতাবে আছে, না এই দুই কিতাবের মানদণ্ডে সহীহ। তবে অন্য কোনো ইমাম একে সহীহ বলেছেন। -মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ, পৃ. ১৭০

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, যাঁরা এই শ্রেণীবিন্যাস করেছেন খোদ তাঁরাই আবার বলেছেন,

أَمّا لَوْ رُجِّحَ قِسْمٌ عَلَى مَا فَوْقَهُ بِأُمُوْرٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيْحَ، فَإِنَّهُ يُقَدّمُ عَلى مَا فَوْقَهُ، إِذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوْقِ مَا يَجْعَلُهُ فَائِقًا.

অর্থাৎ 'অগ্রগণ্যতার অন্যান্য কারণে কোনো প্রকার যদি তার উপরস্থ প্রকারের চেয়ে অগ্রগামী হয় তাহলে তাকে তার উপরের প্রকারের চেয়ে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, এই বিন্যাসে উল্লেখকৃত নীচের প্রকারের বর্ণনার সাথে কখনও কখনও এমন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়, যা তাকে উপরের পর্যায়ের বর্ণনার সমকক্ষ বা অগ্রগণ্য করে।'

কথাটি বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. (৭৫২ হি.) তাঁর শরহু নুখবাতিল ফিকারে (পৃষ্ঠা ৩২)। তাঁর শাগরিদ মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন সাখাভী রাহ.ও (৯০২ হি.) 'ফাতহুল মুগীছে' তা আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন যারকাশী রাহ. (৭৯৪ হি.) 'আন নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ-এ (খ- ১, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৭) এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. তাদরীবুর রাবীতে (খ- ১, পৃষ্ঠা ৮৮) পরিষ্কার লিখেছেন যে, সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারীর অধিক সহীহ হওয়ার অর্থ সমষ্টিগত বিচারে অধিক সহীহ হওয়া। এই নয় যে, সহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীস সহীহ মুসলিমের প্রতিটি হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। যারকাশী রাহ. আরও লিখেছেন, অগ্রগণ্যতার কারণ বিচারে মুহাদ্দিসগণ কখনও কখনও মুসলিমের হাদীসকে বুখারীর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

সুতরাং বুঝা গেল যে, তাঁদের কাছেও 'তাকসীমে সাবঈ' সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য অটল নীতি নয়।

আমরা যদি বাস্তবতা বিচার করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, এই প্রকারভেদ আসলে উসূলে হাদীসের আলোকে সহীহ হতে পারে না। কারণ সহীহ হাদীসের শ্রেণী ও পর্যায় নির্ধারিত হবে ছিহহাত বা শুদ্ধতার শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, বিশেষ কোনো কিতাবে থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে নয়। যেমন অনেক হাদীস শুধু সহীহ বুখারীতে আছে, সহীহ মুসলিমে নেই, কিন্তু তার সনদ এমন যে, তা মুসলিমের মানদণ্ডেও সহীহ। এ ধরনের হাদীসকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেওয়ার কী অর্থ থাকতে পারে? তেমনি কোনো হাদীস বুখারীতে নেই, শুধু মুসলিমে আছে, কিন্তু তার সনদ এমন যে, তা বুখারীর নিকটেও সহীহ। এ হাদীসকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কি অর্থহীন নয়? তদ্রূপ যেসব হাদীস উভয় ইমামের মানদণ্ডে সহীহ সেগুলো কি শুধু এই দুই কিতাবে সংকলিত হয়নি বলেই চতুর্থ শ্রেণীতে চলে যাবে?

এই বাস্তবতা বিচার করেই অনেক মুহাক্কিক ও গবেষক মুহাদ্দিস বলেছেন, এই প্রকারভেদ উসূলে হাদীসের আলোকে সহীহ নয়। দূর অতীতের মুহাদ্দিসগণের ন্যায় নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমাদ শাকির রাহ.ও (মৃত্যু ১৩৭৭ হি.) এই তাকসীম ও প্রকারভেদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেখুন, মুসনাদে আহমাদে সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহের উপর তার ভূমিকা, খ- ৮, পৃষ্ঠা ১৮২

আশা করি উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠ করে আপনি তাকসীমে সাবঈর ভিত্তির উপর গড়ে উঠা মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের মানসিকতার জবাব পেয়ে গেছেন।

এই মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ ইন্টারনেটে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহ.-এর একটি বক্তব্যকে তাদের মানসিকতার পক্ষে একটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এর জবাবে বলব যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহ.-এর বক্তব্য দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তিনি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসকে সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছেন। তিনি ঐ বক্তব্যের পরে পরস্পরবিরোধী দুই হাদীসের মধ্যকার বিরোধ দূরীভূত করার যে উপায়গুলো ব্যক্ত করেছেন তন্মধ্যে একটি উপায়ও এই বলেননি যে, পরস্পরবিরোধী দুই হাদীসের একটি যদি বুখারী বা মুসলিমের হয় তাহলে বুখারী বা মুসলিমের হাদীস অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে।

তিনি আসলে বিশুদ্ধতা ও প্রসিদ্ধতার বিচারে হাদীসের কিতাবসমূহকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম স্তরে তিনি স্থান দিয়েছেন মুয়াত্তা মালেক, বুখারী ও মুসলিম শরীফকে। কিন্তু এ কথা বলেননি যে, মুয়াত্তা মালেক, বুখারী ও মুসলিমের প্রতিটি হাদীস অন্যান্য গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত

হবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহ.-এর বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই পত্রের কলেবর আর বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি না। যতটুকু বললাম তা-ই যথেষ্ট বলে মনে করি।

অধিকতর সহীহ বর্ণনাই কি সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য?

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবসহ অনেকের ধারণা হল, ‘যে হাদীস সনদের বিচারে অধিক সহীহ তা-ই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, বিপরীত হাদীসটি সহীহ হলেও।’ এ কারণেই এই ভাইয়েরা জোড় বাক্যে ইকামত সংক্রান্ত সহীহ হাদীসগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে অন্য জবাবের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলেছেন যে, তাছাড়া হাদীসটি মুসলিমের হাদীসের বিরোধী হওয়ায় শায। কাজেই তা প্রত্যাখ্যাত।

অথচ হাদীসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা দিলে অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই অধিক সহীহ হাদীসটিকে গ্রহণ করা এবং বিপরীতটিকে বর্জন করা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। স্বীকৃত নিয়ম এই যে, এই বিরোধের ক্ষেত্রে জমা, তারজীহ ও নাস্খ তথা সমন্বয় সাধন, অগ্রগণ্য বিচার ও নাসিখ-মানসূখের নিয়ম কার্যকর করতে হবে। তারজীহ বা অগ্রগণ্য বিচারের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে ‘উজূহুত তারজীহ’ বা অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের ভিত্তিতে যে হাদীস রাজিহ বা অগ্রগণ্য হবে সে হাদীসের উপরই আমল হবে। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ সনদের বিচারে অধিক সহীহ হওয়াকেই একমাত্র কারণ বলে মনে করেন। এবং বিশেষত বুখারী মুসলিমের হাদীসকে সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য বলে মনে করেন। অথচ অধিকতর সহীহ হওয়া বা বুখারী মুসলিমে থাকা অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের মধ্য হতে একটি কারণ মাত্র। অগ্রগণ্যতার আরও অনেক কারণ আছে।

ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল হাযেমী রাহ. তাঁর ‘আলই‘তিবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসূখি মিনাল আছার’ কিতাবে (খ- ১, পৃষ্ঠা ১৩২-১৬০) পঞ্চাশটি উজূহুত তারজীহ (অগ্রগণ্যতার কারণ) উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর দ্বারা পরস্পরবিরোধী দুই হাদীসের মধ্যে অগ্রগণ্য নির্ধারণে সহযোগিতা নেওয়া হয়।

এই পঞ্চাশটি কারণের মধ্য হতে একটি কারণও এই বলেননি যে, পরস্পরবিরোধী দুই হাদীসের মধ্যে একটি বুখারী বা মুসলিমে আর অন্যটি অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাকলে বুখারী বা মুসলিমের হাদীসটি অগ্রগণ্য হবে। তিনি পঞ্চাশটি উজূহুত তারজীহ উল্লেখ করার পর বলেছেন, ‘এই পঞ্চাশটি কারণ ছাড়াও অগ্রগণ্যতার আরও অনেক কারণ আছে,

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমি সেগুলোর উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।’

হাফেজ যাইনুদ্দীন আলইরাকী রাহ. (৭২৫-৮০৬ হি.) মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহর উপর তাঁর লিখিত টীকা-গ্রন্থ ‘আত তাক্ঈদ ওয়াল ঈজাহ শারহু মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ’-এ (খ- ১, পৃষ্ঠা ২৮৯) হাযেমী রাহ.-এর উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, উজূহুত তারজীহ বা অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের সংখ্যা একশতেরও বেশি। এরপর তিনি ঐ পঞ্চাশটি কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন অতপর অবশিষ্ট কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ১১০টি উজূহুত তারজীহ বা অগ্রগণ্যতার কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অগ্রগণ্যতার কারণ হিসাবে বুখারী মুসলিমে কোনো হাদীস থাকাকে একটি কারণ হিসাবে যখন উল্লেখ করেছেন তখন সেই কারণকে তিনি ১০২ নম্বরে ফেলেছেন। তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা!

লা মাযহাবী ঘরানার বিশিষ্ট আলেম শাওকানী রাহ. তাঁর ‘ইরশাদুল ফুহূল’ গ্রন্থে অগ্রগণ্যতার ১৬০টি কারণ উল্লেখ করেছেন। সনদগত বিচারে অগ্রগণ্যতার ৪২টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্য হতে বুখারী মুসলিমের হাদীসকে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীসের উপর অগ্রগণ্যতার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন ৪১ নম্বরে ।

তো সনদগত বিচার ছাড়াও অন্যান্য বিচারে অগ্রগণ্যতার কারণসমূহকে উপেক্ষা করে এবং সনদগত বিচারে অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের মধ্য হতে সর্বশেষ কারণটিকে প্রথমেই বিবেচনায় নিয়ে এই কথা বলে দেওয়া যে, হাদীসটি বুখারী মুসলিমের বিরোধী বিধায় শায বা প্রত্যাখ্যাত বা তা গ্রহণযোগ্য নয় কিরূপ অর্বাচিনতা ও হঠকারিতা তা আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন কি?

যঈফ হাদীসও অনেক সময় সহীহ হাদীসের উপর অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়

মুহতারাম, অনেকে মনে করে থাকেন যে, পরস্পরবিরোধী দুইটি হাদীসের মধ্যে যেটি অধিকতর সহীহ সেটিকেই আমলের জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেটিই অপরটির তুলনায় অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, না, এটি মূলনীতি নয়। কেননা, অগ্রগণ্যতা বিচারের বহুবিধ দিক ও কারণ রয়েছে। কাজেই সবসময় অধিকতর সহীহ হাদীস অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয় না। তদ্র ƒ প যঈফ হাদীসের উপর সহীহ হাদীসকে সবসময় অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ, হাদীসের ছিহহাত বা

শুদ্ধতা অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের মধ্য হতে একটি কারণ মাত্র, একমাত্র কারণ নয়। অনেক সময় যঈফ হাদীসকেও সহীহ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাকেই অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

দেখুন স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহ. একটি যঈফ হাদীসকে সহীহ হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। তিনি বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাহ-এর দ্বাদশ অধ্যায়ে (بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ) উরূ সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না- এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন-

وَ حَدِيْثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَ حَدِيْثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتّٰى يخْرُجَ مِنْ إِخْتِلَافِهِمْ.

অর্থাৎ আনাস রা.-এর হাদীস (যার দ্বারা উরূ সতর না হওয়া প্রমাণিত হয়) সনদের বিচারে অধিক সহীহ হলেও জারহাদের হাদীস (যাতে উরূ সতর হওয়ার কথা আছে) সতর্কতার বিচারে অগ্রগণ্য, যাতে ইখতিলাফের মধ্যে থাকতে না হয়।

ফাতহুল বারীতে (খ- ১, পৃষ্ঠা ৫৭১) আছে, ইমাম বুখারী রাহ. 'আত-তারীখুল কাবীরে' জারহাদের হাদীসকে ইযতিরাবের কারণে যঈফ বলেছেন। তাহলে দেখুন, ইমাম বুখারী রাহ. সহীহের বিপরীতে যঈফ হাদীসের উপর আমল করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ এটাই সতর্কতার দাবি। যে মাযহাবে উরূ সতর হওয়ার কথা আছে সেই মাযহাব অনুসারেও যেন গুনাহগার হওয়ার আশংকা না থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, অগ্রগণ্যতার একটিমাত্র কারণকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং সনদের বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিকেই চূড়ান্তভাবে অগ্রগণ্য বলে মনে করা আর তা-ও বিনা তাহকীকে, শুধু এ কারণে যে, বিপরীত হাদীসটি বুখারী মুসলিমে নেই- এই চিন্তা মোটেও ঠিক নয়। সুতরাং অগ্রগণ্যতার অন্যান্য দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। যেমনটা আমরা স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহ.-এর কাছ থেকে দেখলাম।

সুতরাং মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা যে জোড় বাক্যে ইকামতদান সংক্রান্ত প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এটি মুসলিমের হাদীসের বিপরীত বিধায় শায ও প্রত্যাখ্যাত তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আপনিই বিচার করুন।

কথা আরও আছে। তা হল, যদি এমন দুই হাদীসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় যে দুই হাদীসের উভয়টি বুখারী কিংবা উভয়টিই মুসলিমে আছে তাহলে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবরা কী করবেন? যে কোনো একটিকে শায বলবেন?

আমি ফজরের মুস্তাহাব সংক্রান্ত আলোচনায় দেখিয়েছি যে, মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের উপস্থাপিত বুখারীর একটি হাদীসের সঙ্গে বুখারীরই অপর একটি হাদীসের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব একটিকে গ্রহণ করেছেন আর অপরটিকে বর্জন করেছেন। কী কারণে তিনি সেটিকে বর্জন করলেন তা বলেননি। যেটিকে বর্জন করেছেন সেটি কি তাহলে শায হওয়ার কারণে বর্জন করেছেন? আমি উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেখিয়েছি যে, উভয়টিই যথাস্থানে সঠিক ও আমলযোগ্য।

ইকামত সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই আপাতত শেষ করছি। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ যদি এরপর আরও কিছু বলতে চান তো বলতে পারেন। তখন আমিও চেষ্টা করব তার বক্তব্যের ব্যবচ্ছেদ করতে।

উল্লেখ্য, ‘তাকসীমে সাবঈ’সহ শেষের ছয়টি শিরোনামে আলোচিত অগ্রগণ্যতা বিষয়ক আলোচনাটি আমি ইষৎ হ্রাস বৃদ্ধিসহ প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছি হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব রচিত ‘উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা’ পুস্তক থেকে। পুস্তকটির রচয়িতার কাছে আমি ঋণি হয়ে থাকলাম।

আজ এ পর্যন্তই। জানি না আপনি কেমন আছেন। আপনার সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করি। আমার দরখাস্ত, আপনি আমার জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

৫ রবিউস সানি ১৪৩৮ হি.

৫ জানুয়ারী ২০১৭ ঈ.

একটি বই, একটি চিঠি: কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল গাফফার

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে মুসল্লীদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে। এক: কাতার সোজা করে দাঁড়ানো। কোনো মুসল্লী যেন তার পার্শ্ববর্তী

মুসল্লীর চেয়ে এগিয়ে না দাঁড়ায় এবং পিছিয়েও না দাঁড়ায়। দুই: এমনভাবে দাঁড়ানো, যাতে দুই মুসল্লীর মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে। তথা পরস্পরের মাঝে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো। তিন: একটি কাতার থেকে অপর কাতারের মাঝখানে অস্বাভাবিক দূরত্ব না থাকা। বরং স্বাভাবিকভাবে সেজদা করতে যতটুকু দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন ততটুকু দূরত্ব বজায় রেখে কাতার তৈরি করা। কেউ একটু এগিয়ে বা একটু পিছিয়ে দাঁড়ালে কাতার

বাঁকা হয়। এরূপভাবে আগে পিছে দাঁড়ানো, যদ্দারা কাতার বাঁকা হয়ে যায়- সুন্নত-পরিপন্থী। তেমনই ফাঁক রেখে দাঁড়ানো নিয়ম-বিরোধী ও সুন্নত-পরিপন্থী। তদ্রূপ, দুই কাতারের মাঝখানে অস্বাভাবিক ফাঁক রেখে কাতার করাও নিয়ম ও সুন্নত-পরিপন্থী। এসব

বিষয়ে কারও কোনো দ্বিমত নাই। থাকতেও পারে না। দ্বিমত দেখা দিয়েছে নববী যুগের তেরশ বছর পরে। যখন আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কিছু ভাই এই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যে, নামাযে প্রত্যেককে অপরের পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং প্রয়োজনে সেই উদ্দেশ্যে দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়াবে!! অথচ না এটা কোনো হাদীসের শিক্ষা আর না

সালাফ ও খালাফের কোনো ফকীহ বা মুহাদ্দিসের বক্তব্য বা আমল এর পক্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব এই নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিরই সমর্থন করে গেলেন! ‘জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছালাত’ বইটিতে তার বক্তব্য হল, কাতারের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ করতে হলে মুসল্লীদের প্রত্যেককে অপরের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি লিখেছেন, পায়ে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

ছালাতে দাঁড়াতে হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বহু হাদীছে নির্দেশ করেছেন। এরপর বেশ

[illegible]

[illegible] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ سَدّ فُرْجَةً فِى صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَ بَنٰى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ. [illegible]

[illegible]

[illegible] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اِنّ اللهَ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَ مَنْ سَدّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً. [illegible]

[illegible] عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَ

حَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَ سُدُّوْا الْخَلَلَ وَ لِيْنُوْا بِأَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَ لَاتَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَ مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. [illegible]

[illegible]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَتَخَلّلُ الصّفّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَ مَنَاكِبَنَا وَ يَقُوْلُ لَاتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَ كَانَ يَقُوْلُ إِنّ اللهَ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ. [illegible]

[illegible]

[illegible]

عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِی الصّلَاةِ وَ يَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَ لَاتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِیْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَ النُّهٰى ثُمّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمّ الّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا.

[illegible]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصّلَاةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّی اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِیْ.

[illegible]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلُ الله صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَ قَارِبُوْا بَيْنَهَا وَ حَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالذِی نَفْسِیْ بِيَدِهِ اِنّیْ لَاَرَى الشّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفِّ كَاَنّهَا الْحَذَفُ.

[illegible]

[illegible] -[illegible] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى راٰى اَنّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ فَراٰى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرَهُ مِنَ الصّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] -[illegible]

[illegible] -[illegible] عَنْ اَبِى الْقاسِمِ الْجَدَلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيْمَنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَ كَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] -[illegible] عَنْ اَنَسٍ عَنِ النّبِىِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَ كَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَ قَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] -[illegible]

হাদীস ৭২৫ এই শেষোক্ত (৯ ও ১০ নং) হাদীসদুটিতে সাহাবীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে, সাহাবীগণের কেউ কেউ তাদের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পায়ের সাথে পা, হাঁটুর সাথে

হাঁটু, এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দিতেন। পর্যালোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম হাদীসে কাতারের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ করার ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসেও ফাঁক বন্ধ করার ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয় হাদীসে কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ফাঁক বন্ধ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চতুর্থ হাদীসে কাতার সোজা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপ ভূমিকা পালন করতেন তা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম হাদীসেও কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং কাতার সোজা না করার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ হাদীসে কাতার সোজা করার নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে এবং গায়ে গায়ে মিশে মিশে দাঁড়ানোর তথা ফাঁক বন্ধ করার নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। সপ্তম হাদীসে একটি কাতার থেকে অপর কাতারের দূরত্ব বেশি না রেখে কাছাকাছি রাখতে বলা হয়েছে এবং কাতার সোজা করার জন্য প্রত্যেকের ঘাড়কে সমান্তরালে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কাতারে মুসল্লীদের মাঝখানে ফাঁক থাকলে সেই ফাঁকা জায়গায় শয়তান প্রবেশ করে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অষ্টম হাদীসেও কাতার সোজা করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং কাতার বাঁকা করে দাঁড়ানোর পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। নবম ও দশম হাদীসেও কাতার সোজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাতার সোজা না করলে যে কুফল সৃষ্টি হবে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই নবম ও দশম হাদীসে সাহাবী যথাক্রমে হযরত নু‘মান ইবনে বাশীর ও হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ তাদের একজন অপরজনের কাঁধের সাথে

কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু, টাখনুর সাথে টাখনু এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দিত। সুধী পাঠক, প্রথমত কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু, টাখনুর সাথে টাখনু এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ হিসাবে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুধু কাতার সোজা করার কথা এবং ফাঁক বন্ধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর কাঁধের সাথে কাঁধ, টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর

আমলটি পাওয়া যাচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক। সুতরাং মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের এই দাবী- পায়ে পা, টাখনুর সাথে টাখনু, ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাতে দাঁড়াতে হবে

মর্মে রাসূল (ছাঃ) বহু হাদীসে নির্দেশ করেছেন- আদৌ সঠিক নয়, বরং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয়ত একটু মনোনিবেশ করে দেখুন যে, সাহাবীদ্বয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কোন কথার পরে এই বর্ণনা দান করেছেন। সাহাবীদ্বয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কাতার সোজা করার নির্দেশদানের

বিবরণদানের পর সাহাবীগণের আমল উল্লেখ করেছেন। ফাঁক বন্ধ করার নির্দেশদানের

বিবরণদানের পরে নয়। বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ ঐরূপ আমল করতেন কাতারের ফাঁক বন্ধ

করার জন্য নয়। তারা ঐরূপ আমল করতেন কাতার সোজা করার জন্য। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁরা নামাযের পুরো সময়ে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে রাখতেন না। বরং তাঁরা ঐরূপ আমল করতেন কাতার

সোজা হল কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে এবং হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে তাঁরা দেখে নিতেন যে, কাতার সোজা হল কি না। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবগণ সাহাবীদ্বয়ের কথার মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। তাঁরা শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ

করেছেন। শব্দ ও বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ তাঁরা বুঝতে ও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদ্দেশ্য হল, কাতার সোজা করা। আর পায়ের সাথে পা মিলানো, টাখনুর সাথে টাখনু

মিলানো ইত্যাদি কাজগুলো ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায় মাত্র। মুযাফফর বিন

মুহসিন সাহেবগণ উপায়কেই উদ্দেশ্য বলে ঠাউরে নিয়েছেন। ফলে তাঁদের পোষিত মত হয়ে

গেছে হাদীস থেকে অনেক দূরের মত। তাঁদের পোষিত মত হাদীসের অর্থ ও মর্মের ধারে

কাছেও নেই। বলতে দ্বিধা নেই যে, সালাতের পুরো সময়ে এইরূপ একের পা অপরের পায়ের সাথে মিলিয়ে রাখা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে রাখা, হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে

রাখা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। কারণ, মানুষের দেহের উর্ধ্বাংশ নিম্নাংশ অপেক্ষা অধিক চওড়া। আর তা দুটো হাতের কারণে। হাত দুটোর গোড়ার অংশ কাঁধের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে কাঁধ হয়ে গেছে নিম্নাংশ অপেক্ষা অধিক চওড়া। অতএব পা দুটো যদি স্বাভাবিক ফাঁক রেখে দাঁড়ানো হয় তাহলে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো সম্ভব হবে কিন্তু তখন পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানো এবং হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব হবে। আর যদি পা দুটো অস্বাভাবিক ফাঁক করে দাঁড়ায় তবে পায়ের সাথে পা মিলানো সম্ভব হবে কিন্তু

وَ مِنَ الْهَيْآتِ الْمُضَافَةِ مُجَدّدًا اِلَى الْمُصَافّةِ بِلَامُسْتَنَدٍ مَا نَرَاهُ مِنْ بَعْضِ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ مُلَاحَقَتِهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ اِنْ كَانَ فِى يَمِيْنِ الصّفِّ وَ مَنْ عَلٰى يَسَارِهِ اِنْ كَانَ فِى مَيْسَرَةِ الصّفِّ وَلـَىِّ الْعَقِبَيْنِ لِيُلْصِقَ كَعْبَيْهَ بِكَعْبِ جَارِهِ، وَهٰذِهِ هَيْئَةٌ زائِدَةٌ عَلَى الْوَارِدِ، فِيْهَا اِيْغَالٌ فِى تِطْبِيْقِ السُّنّةِ. وَهِىَ هَيْئَةٌ مَنْقُوْضَةٌ بِاَمْرَيْنِ : اَلْاَوّلُ اَنّ الْمصَافّةَ هِىَ مِمّا يَلِى الْاِمَامَ فَمَنْ كَانَ عَلٰى يَمِيْنِ الصّفِّ فَلْيُصَافّ عَلٰى يَسَارِهِ مِمّا يَلِى الْاِمَامَ، وَ هٰكَذَا يَتَرَاصُّوْنَ ذَاتَ الْيَسَارِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ عَلٰى سمْتٍ وَاحِدٍ فِى تَقْوِيْمِ الصّفِّ، وَ سَدِّ الْفُرُجِ، وَالتّرَاصِّ وَالْمُحَاذَاةِ بِالْعُنُقِ وَالْمَنْكبِ وَالْكَعْبِ وَ اِتْمَامِ الصّفِّ الْاَوّلِ فَالْاَوّلِ اَمّا مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَ يَلْفِتَ قَدَمَهُ حتّى يَتِمّ الْاِلزَاقُ، فَهٰذَا ▯ وَ هُوَ فِى يَمِيْنِ الصّفِّ ▯ اَنْ يُلَاحِقَ بِقَدَمِهِ الْيُمْنٰى غَلَطٌ بَيِّنٌ، وَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ، وَ فَهْمٌ مُسْتَحْدَثٌ فِيْهِ غُلُوٌّ فِى تَطْبِيْقِ السُّنّةِ، وَتَضْيِيْقٌ وَمُضَايَقَةٌ، وَ اِشْتِغَالٌ بِمَا لَمْ يُشْرَعْ، وَتَوْسِيْعٌ لِلْفُرُجِ بَيْنَ الْمُتَصَافّيْنِ، يَظْهُرُ هٰذَا اِذَا هَوَى الْمَامُوْمُ لِلسُّجُوْدِ، وَ تَشَاغَلَ بَعْدَ الْقِيَامِ لِمَلَأِ الْفَرَاغِ، وَلَىِّ الْعَقِبِ لِلْاِلْزَاقِ وَتَفْوِيْتٌ لِتَوْجِيْهِ رُؤُوْسِ الْقَدَمَيْنِ اِلَى الْقِبْلَةِ. وَ فِيْهِ مُلَاحَقَةُ الْمُصَلِّى لِلْمُصَلِّى بِمَكَانِهِ الّذِىْ سَبَقَ اِلَيْهِ، وَ اِقْطَاعٌ لِمَحَلِّ قَدَمِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍ، وَ كُلُّ هٰذَا تَسَنُّنٌ بِمَا لَمْ يُشْرَعْ. اَلثّانِىْ اَنّ النّبِىّ

صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ لَمَّا اَمَرَ بِالْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَالْاَكْعُبِ قَدْ اَمَرَ اَيْضًا بِالْمُحَاذَاةِ بِيْنَ الْاَعْنَاقِ كَمَا فِى
وَكُلُّ هٰذَا يَعْنِى الْمصَافّةَ وَ الْمُوَازَاةَ (رقم الحديث) حَدِيْثِ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ النّسَائي
وَالْمُسَامَتَةَ وَ سَدّ الْخَلَلِ ، وَلَايَعْنِىْ الْعَمَلَ عَلَى الْاِلْزَاقِ فَاِنّ الْزَاقَ الْعُنُقِ بِالْعُنُقِ مُسْتَحِيْلٌ، وَ اِلْزَاقُ الْكَتِفِ
بِالْكَتِفِ فِى كُلِّ قِيَامٍ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ، وَ اِلْزَاقُ الرُّكْبَةِ بِالرُّكْبَةِ مُسْتَحِيْلٌ، وَ اِلْزَاقُ الْكَعْبِ بِالْكَعْبِ فِيْهِ مِنَ التّعَذُّرِ
و التّكَلُّفِ وَ الْمُعَانَاةِ وَ التّحَفُّزِ والْاِشْتِغَالِ بِهِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مَاهُوَ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ. فَتَبَيّنَ اَنّ الْمُحَاذَاةَ فِى الْاَرْبَعَةِ
اَلْعُنُقِ اَلْكَتِفِ اَلرُّكْبَةِ اَلْكَعْبِ مِنْ بَابَةٍ وَاحِدَةٍ يُرَادُ بِهَا الْحَثُّ عَلٰى اِقَامَةِ الصّفِّ وَالْمُوَازَاةِ وَالْمُسَامَتَةِ وَالتّرَاصِّ
عَلٰى سِمْتٍ وَاحِدٍ بِلَاعَوْجٍ وَلَافُرُجٍ. وَبِهٰذَا يَحْصُلُ مَقْصُوْدُ الشّارِعِ.

[illegible]

[illegible] محاذاة [illegible]

[illegible] : اَلصّحِيْحُ اَنّ الْمُعْتَمَدَ فِى تَسْوِيَةِ الصّفِّ مُحَاذَاةُ الْكَعْبَيْنِ بَعْضِهِمَا بَعْضًا لَارؤُوْسِ الْاَصَابِعِ، وَ ذٰلِكَ لِاَنّ الْبَدَنَ مركبٌ عَلَى الْكَعْبِ، وَالْاَصَابِعُ تَخْتَلِفُ الْاَقْدَامُ فِيْهَا فَهُنَاكَ الْقَدَمُ الطّوِيْلُ وَهُنَاكَ الْقَدَمُ الْقَصِيْرُ فَلَايُمْكِنُ ضَبْطُ التّسَاوِىْ اِلّا بِالْكَعْبِ، وَ اَمّا اِلْصَاقُ الْكَعْبَيْنِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ فَلَاشَكّ اَنّهُ وَارِدٌ عَنِ الصّحَابَةِ رَضِىَ الله عنهم فَاِنّهُمْ كَانُوْا يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ بِاِلْصَاقِ الْكَعْبَيْنِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ أَىْ اَنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ جَارِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُحَاذَاةِ وَتَسْوِيَةِ الصَّفِّ، فَهُوَ لَيْسَ مَقْصُوْدًا لِذَاتِهِ لٰكِنّهُ مَقْصُوْدٌ لِغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ، وَ لِهٰذَا اِذَا تَمّتِ الصُّفُوْفُ وَ قَامَ النّاسُ يَنْبَغِىْ لِكُلِّ وَاحِدٍ اَنْ يُلْصِقَ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ، وَ لَيْسَ مَعْنٰى ذٰلِكَ اَنْ يُلَازِمَ هٰذَا الْاِلْصَاقَ وَ يَبْقٰى مُلَازِمًا لَهُ فِي جَمِيْعِ الصّلَاةِ. وَ مِنَ الْغُلُوِّ فِى هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ مَايَفْعَلُهُ بَعْضُ النّاسِ مِنْ كوْنِهِ يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَيَفْتَحُ قدَمَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا حَتّى يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ فِى الْمَنَاكِبِ فُرْجَةٌ فَيُخَالِفَ السُّنّةَ فِى ذٰلِكَ، وَ الْمَقْصُوْدُ اَنّ الْمَنَاكِبَ وَ الْاَكْعُبَ تَتَساوٰى. [illegible]

[illegible]

টাখনুর উপরে। আর আঙ্গুলগুলো পায়ের মাপের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়ে

থাকে। কিছু পা থাকে বেশ লম্বা আর কিছু থাকে খাট। সে ক্ষেত্রে পায়ের টাখনু বরাবর

করা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে কাতার বরাবর ও সোজা করা সম্ভব নয়। বাকি রইল টাখনুদ্বয় পরস্পরে মিলিত করা; তো তা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা কাতার সোজা করতেন টাখনুদ্বয় পরস্পরে মিলিত করে। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের টাখনু পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর টাখনুর সাথে মিলিয়ে দিতেন কাতার

বরাবর ও সোজা হল কি না তা নিশ্চিত করতে। সুতরাং টাখনু মিলিত করা মূল উদ্দেশ্য নয়।

তা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণের নিমিত্ত মাত্র। অতএব কাতার পূর্ণ হলে এবং মানুষ দাঁড়িয়ে গেলে প্রত্যেকের জন্য উচিত হল কাতার সোজা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হতে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরো নামাযে এভাবে টাখনুর সাথে টাখনু সর্বক্ষণের জন্য মিলিয়ে রাখবে। অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুছুল্লীর টাখনুর সঙ্গে টাখনু মিলাতে গিয়ে নিজের দু পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে তার ও তার পার্শ্ববর্তী

মুসল্লীর কাঁধের মাঝে দূরত্ব ও ফাঁক সৃষ্টি হয়। ফলত তা হয়ে যায় সুন্নাত বিরোধী। উদ্দেশ্য হচ্ছে টাখনু ও কাঁধসমূহকে বরাবর রাখা। (শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীন, ফতোয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ২৩৪-এর জবাব) উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব মসজিদেই লম্বা ও সোজা রেখা অঙ্কন করা থাকে। অথবা গালিচা, মাদুর বা এইজাতীয় কিছু বিছানো থাকে। ফলে রেখার উপর কিংবা গালিচা, মাদুর ইত্যাদির পিছন দিকের শেষ প্রান্তে প্রত্যেকেই যদি গোড়ালী রাখে তা হলে কাতার সোজা ও বরাবর হয়ে

যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের যুগে এরূপ কিছু ছিল না। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই উভয় পার্শ্বের মুসল্লীর টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে নিতেন এবং তদ্দারা তাঁরা নিশ্চিত হতেন যে, কাতার সোজা হল কি না। ফাঁক বন্ধ করার জন্য তাঁরা এরূপ করতেন না। এবং পূর্ণ নামাযে এভাবে টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে রাখতেন না। শাইখ সালেহ আল উছাইমীন এবং বকর বিন আবদুল্লাহ আবূ যায়দের বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে রেখে কাঁধের সঙ্গেও কাঁধ মিলানো অসম্ভব- এই কথাটিও তাঁদের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাতার সোজা করতে হবে এবং ফাঁক বন্ধ করতে হবে। কাতার সোজা করতে গোড়ালী অথবা টাখনু বরাবর হল কি না তা দেখতে হবে এবং ফাঁক বন্ধ করতে হলে পরস্পরের কাঁধকে মিলিয়ে রাখতে হবে। যদি কাঁধ মিলিয়ে

রাখে তবেই ফাঁক বন্ধ হবে। টাখনুর সাথে টাখনু ও হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলাতে গেলে একদিকে তা হবে আয়াসসাধ্য কাজ অপরদিকে তাতে পরস্পরের কাঁধের মাঝে সৃষ্টি হবে দূরত্ব ও ফাঁক। এক বর্ণনায় হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলানের কথা থাকলেও মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর মূল বক্তব্যে তিনি টাখনুর সাথে টাখনু ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানোর কথা বলেছেন। কারণ, তিনিও হয়তো বুঝেছেন যে, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো কষ্টকর হলেও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলানো অধিকতর কষ্টকর। বরং প্রায় অসম্ভব। দেখুন ইমাম বুখারী রাহ. একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম লিখেছেন এভাবে: بَابُ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ وَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ. 'কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো এবং পায়ের সাথে পা মিলানো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমাদের মধ্য হতে ব্যক্তিকে দেখেছি তার টাখনুকে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখনুর সাথে মিলিয়ে দিতে।' বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. এই অনুচ্ছেদের অধীনে লিখেছেন: (قَوْلُهُ بَابُ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ) اَلْمُرَادُ بِذَالِكَ اَلْمُبَالَغَةُ فِى تَعْدِيْلِ الصَّفِّ وَ سَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْاَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَ التَّرْغِيْبُ فِيْهِ فِى اَحَادِيْثٍ كَثِيْرَةٍ اَجْمَعُهَا حَدِيْثُ اِبْنِ عُمَرَ عِنْدَ اَبِى دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَ الْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ اَنّ رَسُوْلُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَ حَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ وَلَاتذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله وَ مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কাতার সোজা করার ব্যাপারে এবং ফাঁক বন্ধ করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। অনেক হাদীসেই ফাঁক বন্ধ করার নির্দেশ এবং এতদসম্পর্কে উৎসাহ প্রদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সেসব হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক হাদীসটি ইবনে উমারের হাদীস। যেটি বর্ণিত হয়েছে আবূ দাঊদে। ইবনে খুযাইমাহ ও হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কাতারকে সোজা কর এবং কাঁধসমূহকে বরাবর কর এবং ফাঁক বন্ধ কর। শয়তানের জন্য ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দিয়ো না। আর যে ব্যক্তি কাতারকে মিলিয়ে দেয় আল্লাহও তাকে মিলিয়ে দেন, আর যে ব্যক্তি কাতারকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। দেখুন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করতে

حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَرَأى رَجُلاً صَافّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ : أَلْزِقْ إحْدَاهُمَا بِالأُخْرٰى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ.

: بَلْ

ثِقَةٌ، وَثّقَهُ اِبْنُ مَعِيْنٍ، وَ وَكِيْعٌ، وَ اِبْنُ سَعْدٍ، وَ الْعِجْلِى، وَ النّسائي، وَ قَالَ اَحْمَدُ لِيْسَ بِهِ بَاسٌ، صَالِحُ الْحَدِيْثِ

وَ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ صَدُوْقٌ وصَحّحَ التّرْمِذِىُّ حَدِيْثَهُ وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبّانَ فِى "الثِّقَاتِ" وَلَانَعْلَمُ فِيْهِ جَرْحًا. [illegible]

[illegible]

[illegible] : حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قَالَ إِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ

أَحَدُ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে তখন সে যেন তার জুতোজোড়া তার ডানে না রাখে এবং বামেও না রাখে। কেননা তার বাম অপরের ডান। তবে তার বামে যদি কেউ না থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। সে যেন তার জুতোজোড়া তার দুই পায়ের মাঝখানে রাখে। -সুনানে আবূ দাঊদ, হাদীস ৬৫৪ হাদীসটির মান: হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইবনে কায়স ব্যতীত হাদীসটির সকল রাবী বুখারী ও মুসলিমের রাবী। আর আবদুর রহমান ইবনে কায়স সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মাকবুল শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাশশার রাওয়াদ মারূফ এবং শুআইব আল আরনাঊত কিছুটা আপত্তির সুরে বলেছেন: بَلْ صَدُوْقٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ فَقَدْ رَوٰى عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْكِبَار الرُّفَعَاءِ ، وَ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبّانَ فِى الثِّقَاتِ ، وَ لَانَعْلَمُ فِيْهِ جَرْحًا. বরং সত্যনিষ্ঠ, হাসানুল হাদীস। তাঁর থেকে তো হাদীস বর্ণনা করেছেন বড় বড় উচ্চমানের একদল নির্ভরযোগ্য রাবী। এবং ইবনে হিব্বান তাঁর আছ-ছিকাত গ্রন্থে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কোনো আপত্তি ও সমালোচনা আছে বলে আমাদের জানা নাই। মাকবুল শব্দটি তাওছীকের সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি শব্দ। বাশশার আওয়াদ মারূফ এবং শুআইব আলআরনাউত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী কর্তৃক উয়াইনাহ সম্পর্কে মাকবুল শব্দের ব্যবহারকে অপছন্দ করে বলতে চাচ্ছেন যে, উয়াইনাহ মাকবুল অপেক্ষা উচ্চতর পর্যায়ের। তিনি সাদূক, তাঁর হাদীস হাসান পর্যায়ের। তাছাড়া শায়েখ আলবানী রাহ.ও হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। ১ জামাতে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে তার জুতোজোড়া দুই পায়ের মাঝখানে রাখার পরামর্শ দান প্রমাণ করে যে, মুসল্লী তার দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁক রেখে দাঁড়াবে। দুই পা একেবারে মিলিয়ে দাঁড়াবে না।২ উপরে বর্ণিত এই বারোটি হাদীস থেকে যে সারনির্যাস বের হয়ে আসে তা এই যে, কাতারে মুসল্লীবৃন্দ যখন দাঁড়াবে তখন কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। প্রয়োজনে কাতার সোজা হল কি না তা যাচাই করতে একজন অপরজনের টাখনুর সাথে টাখনু, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দেখে নেওয়া যায়। কিন্তু পুরো সালাতের সময়ে পরস্পরে একে অপরের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু, এবং হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে রাখবে না। তা হাদীসের উদ্দেশ্যও নয় এবং তা সম্ভবও নয়। দ্বিতীয়ত কাতারের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে। আর তা করতে একজন অপরজনের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দেবে।

[illegible] صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ [illegible]

[illegible] صفٌّ [illegible]

[illegible] صَفّ الْقَوْمُ اَىْ اِنْتَظَمُوْا فِى صَفٍّ وَاحِدٍ [illegible]

[illegible] اَلْزِقْ اِحْدَاهُمَا بِالْاُخْرٰى [illegible]

[illegible] كَاَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافّ [illegible]

পাখীর দুটো দল ।সহীহ মুসলিম , হাদীস ১৯১২।) লিসানুল আরব-এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে صَوَافّ শব্দটির তরজমা করা হয়েছে : بَاسِطَاتٍ اَجْنِحَتَهُنّ فِى الطّيْرَانِ অর্থাৎ উড়ার ক্ষেত্রে তাদের পাখা বিস্তারকারী। বিস্তার করা অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া। صَافّاتٍ ও صَوَافّ এই উভয় শব্দই صَافّةٌ -এর বহুবচন ।সূরা মুল্ক -এ আছে أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافّاتٍ । বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীরে আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী রাহ . মুজাহিদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ।মুজাহিদ صافّاتٍ -এর তাফসীরে বলেছেন : بسط اجنحتهن। সুতরাং আমি যে তরজমা করেছি তা সঠিক ও যথোপযুক্ত বলেই মনে করি।